প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য

প্রাপ্তিস্থান
বরেন্দ্র লাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

প্রকাশক—বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য
বারণপুর বর্দ্ধমান

প্রথম সংস্করণ
মূল্য পাঁচ সিকা
শ্রাবণ ১৩৪৪

প্রিন্টার—বি, এন, ঘোষ
আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিবেদন

কয়েক জন বন্ধু বান্ধবের নিয়ত তাগিতের জন্য পুস্তকখানি যত শীঘ্র বাহির হয়, তা ছাড়া নিজেরও সময়ের অল্পতা হেতু প্রুফ কপি ভাল করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই! সে হেতু অনেক ভুল প্রমাদ থাকিয়া গিয়াছে। আমার প্রিয় পাঠক পাঠিকারা আমার এই ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। বারান্তরে সংশোধন করিয়া সাধারণে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা থাকিল। ইতি

গ্রন্থকার

উৎসর্গ

বাংলার পতিতা, ধর্ষিতা, লাঞ্ছিতা
ভগিনীগণের কর কমলে :

কৈফিয়ৎ

একটি বিশিষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া এই পুস্তক খানি লিখিতে আরম্ভ করি কাজেই সামান্য একটু কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। জানি যে উপন্যাস, নাটক, আত্মকথা প্লাবিত বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে আবার একটী আত্ম-কাহিনীর আবির্ভাব সুধিজন সমাজে নিশ্চয়ই আগাছার মত প্রতিভাত হইবে। তবু সান্ত্বনা এই টুকু যে বঙ্গ জননীর বাণী-পিঠের প্রসার ক্ষুদ্র নয়—এর অঙ্গনে শত সহস্র প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান বৃক্ষ লতিকার সমাবেশের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র আগাছাও স্থান পাইতে পারে—যদি দূর্ভাগ্য ক্রমে স্থান নাও পায় তবু কোনো সুধীজন ছুরিকা ঘাতেই ইহার বিনাশ হইবে তাহাতেও ইহার পচন-ক্রিয়ায় বাণীর কমল বনের উর্ব্বরতাই বৃদ্ধি পাইবে—তাহাও এই অভাজনের পক্ষে অল্প লাভ নয়।

ইংরাজি ১৯১৯ সালের মার্চ্চ মাসে মদীয় উড়িষ্যা ভ্রমণ কালে একটী লাবণ্যবতী প্রৌঢ়ার মুখে তাঁহার নিজের জীবনের করুণ কাহিনী শুনিয়া —এই সম্বন্ধে একটী বই লিখিয়া শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করিবার দুর্নিবার আগ্রহে আমি তাঁহার অনুমতি লইয়া আমার ডায়রীতে তাঁহার বর্ণিত ঘটনার মূল সূত্রগুলি........সংগ্রহ করিয়া রাখি। পরে তাঁহার বর্ণিত আত্ম-কাহিনীকে সম্পূর্ণ অবিকৃত রাখিয়া একটী পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করি। কিন্তু নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে ও দৈব বিড়ম্বনায় পুস্তক খানি অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, অধুনা সংবাদ পত্রে প্রত্যহ পূর্ব্ব বঙ্গে নারী নিগ্রহের করুণ-কাহিনী পাঠ করিয়া ও অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া

পূর্ব্ব বর্ণিতা পতিতার আত্ম-কাহিনী প্রচারের বাসনা প্রবল হয়। তাই বহু অনুসন্ধানের পর পুরাতন অযত্ন রক্ষিত ফাইল হইতে অসমাপ্ত রচনা খানি বাহির করিয়া স্থানে স্থানে সামান্য সামান্য রদ বদল করিয়া এই পুস্তক খানি প্রকাশ করিলাম। সাধ্যমত তাঁহার বর্ণিত ঘটনা গুলির পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া ও সযত্নে অতিরঞ্জন বর্জ্জন করিয়া পুস্তকখানি লিখিয়াছি।

সময় সময় সত্য কল্পনাকেও অতিক্রম করিয়া যায়—তাঁহার বর্ণিত ঘটনা গুলির মধ্যে যদি কিছু মাত্র সত্যের লেশও থাকিয়া থাকে তবে পাঠক বর্গ বিচার করিবেন যে আমাদের সমাজের ভিত্তি-প্রস্তর কতদূর শিথিল হইয়া উঠিয়াছে। পুস্তক খানিকে হাল্কা উপন্যাসের মত পড়িয়া গেলে আমার উপর অবিচার করা হইবে—যদি ইহা পাঠে কাহারও মস্তকে সামান্যও আলোড়ন উপস্থিত হয় তবেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব! সুধী সমাজ সংস্কারকগণের দৃষ্টি—এদিকে আকর্ষণ করি আর মা ভগ্নীদের শ্রীচরণে কোটী কোটী প্রণিপাত করিয়া বলি যে কোটী শিয়াল কুকুরের জননী হওয়ার চেয়ে একটী সত্য কারের মানুষের জন্ম দেওয়া বহু শ্লাঘার। সন্তানকে বক্ষে ধরিয়া ঘুম পাড়ানী গান না গাহিয়া, তাঁহারা দেশ মাতৃকার সেবা ও নারীর মর্য্যাদা রক্ষার্থ জীবন দানের শিক্ষা তাদের প্রতি শোণিত বিন্দুতে প্রবাহিত করিয়া দিন। অলমতি বিস্তরেন।

বৈদ্যনাথ

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

—'পাপ করিলেই যে পুণ্য করিতে হইবে না, এমন কোন কথা নাই'—যখন এই প্রাণস্পর্শী সত্য কথা আপনার মুখ হইতে শ্রবণ করিলাম, তখনই আমার হৃদয়-দুয়ারে অকস্মাৎ কে যেন একটা প্রচণ্ড করাঘাত করিল এবং সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সত্যের ব্যঞ্জনাগুলি কোনটা সুরে কোনটা বা বেসুরে ঐক্যতান বাদনের ন্যায় একই সময়ে বাজিয়া উঠিল এবং এক বিরাট সুর-সমারোহ সৃষ্টি করিয়া আমার অন্তরাকাশ আলোড়িত করিতে লাগিল। সেই মর্ম্মভেদী গুরু-গম্ভীর সুর আমার অন্তরের নিভৃত স্থান হইতে বাহির হইয়া বিশ্বের যাবতীয় অণু পরমাণুতে আশ্রয় লইবার জন্য ব্যাকুল ভাবে ছুটিতে লাগিল। সেই ব্যগ্র সুরের গতি যে এত দ্রুত হইতে পারে তাহা প্রথমে জানিতে পারি নাই; যখন লক্ষ্য করিলাম, তখন সে আমার নিকট হইতে এত দূরে সরিয়া গিয়াছে যে, একটা অচিন্তিত মধুর স্মৃতি ব্যতীত তাহার আর কোনই চিহ্ন নাই! শক্তি তাহার কতটুকু তাহা কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল মোহ তন্দ্রার ঘোরে এইটুকু মাত্র অনুভব করিয়াছিলাম—কি যেন

এক অদৃশ্য বস্তু আমার কর্ণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া মর্ম্মের নিগূঢ় প্রদেশে বঁড়শির ন্যায় আটকাইয়া গিয়াছে; আর এক বিরাট শক্তি দিক-চক্রবালের অন্তরাল হইতে ক্ষীণ রজ্জু দ্বারা আমায় নিয়ত আকর্ষণ করিতেছে। আমি প্রতি মুহূর্ত্তে মনে করিতেছি, এখনই এই দণ্ডে—এই সামান্য সূত্র-গ্রন্থি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাসনা-সলিলে স্ব ইচ্ছায় সন্তরণ করিয়া বেড়াইব। কিন্তু হায় রে দুরাশা!—তখন তো বুঝিতে পারি নাই, যে এই সামান্য গ্রন্থির মধ্যে যে অসামান্য শক্তি অজ্ঞাতে অবস্থান করিতেছে, তাহা ছিন্ন করিতে গিয়া আমারই মত বাসনাবিদগ্ধ লক্ষ লক্ষ নরনারী কি অবস্থায় কোথায় ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের সন্ধানের ঠিকানা সংসারের কয়জনে জানে!

এ কোন্ শক্তি, কোন্ পথে যাওয়া-আসা করে, জানিবার জন্য যখন আমার বাসনা-জড়িত অলস আঁখি উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম, সূচীভেদ্য নিবিড় অন্ধকারে দিক-দিগন্ত সমাচ্ছন্ন! লালসার ঘন গর্জ্জনে চারি দিক ঝটিকাবিক্ষুব্ধ বারিধির ন্যায় আলোড়িত হইতেছে! কোনও কিছুই দেখিবার উপায় নাই, কেবল দূরে, অতি দূরে কোন্ সে এক অজানা দেশে, একটী শান্তি দীপ টিপ্ টিপ্ করিয়া জ্বলিতেছে। আর সেই অকম্পিত দীপশিখার ক্ষীণ আলোকে কত পথিক নিজের পথ দেখিয়া লইয়া আপনার যাহা কিছু সম্বল মাথায় বহিয়া ধীরে ধীরে স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিতেছে। হা—ভগবান! আমি যে রাত-কাণা, এই

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

শান্তি-প্রদীপের অস্পষ্ট আলোকে আজ কেমন করিয়া পথ চিনিয়া লইব? আর চিনিলেই বা অত দীর্ঘপথ হাঁটিবার মত শক্তি আমার কোথায়? আমি যে দুর্ব্বল পাথেয়-বিহীন পথিক! পথের সম্বল যে আমার কিছুই নাই!

সহসা অজ্ঞাত করাঙ্গুলি-স্পর্শের বীণার ঝঙ্কারে আমার ব্যগ্র হৃদয়ে সুমধুর সুর বাজিয়া উঠিল; আর সেই সুরের সঙ্গে সঙ্গে বহু দূরের অজানা দেশের সেই শান্তিময় দীপাধার ঘিরিয়া লীলায়িত-ভঙ্গীতে কে যেন এক মধুর সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। আর সেই মহাসঙ্গীতের প্রতিধ্বনি ভাসিতে ভাসিতে মহাসমুদ্রের ওপার হইতে এ পারে আসিয়া আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। কি সে বিশ্বব্যাপী অপরূপ সুর লহরী! সেই মহাগীতের ভাষা বুঝিবার মত ক্ষমতা আমার না থাকিলেও তাহার অন্তরস্পর্শী ভাবে বুঝিলাম—যেন বলিতেছে,—"এ মহাসমুদ্রের উত্তাল-তরঙ্গ দেখিয়া ভয় পাইও না। ইহার সমস্ত বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ ভাবিয়া সাহস করিয়া আমার কাছে এই শান্তি-ধামে চলিয়া আইস। এখানে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু, কিছুরই ভয় নাই। ইহা চির শান্তিময় চির শান্তিপ্রদ স্থান"। আমি যে মোহান্ধ সহায়-সম্বলহীনা, সে কথা আমার একবারও মনে হইল না। ভাবিলাম কত যে কপর্দ্দকহীন দুঃস্থ অন্ধ সামান্য একখণ্ড যষ্টির সাহায্যে লক্ষ্য করিয়া এই সঙ্কেত-বাণী সম্বল করিয়াই নিদারুণ পথকষ্টকে অবজ্ঞায় দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া ঐকান্তিকতার সহিত সুদূর তীর্থযাত্রা করে; আমি না হয় বিনা মাঝির সাহায্যে, ঐ সুদূরের শান্তি-দীপটি লক্ষ্য করিয়াই, সেই আকাঙ্ক্ষিত দেশে যাইবার জন্য মাত্র অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া জীবন-তরী এই অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া

দিব। অদৃষ্টের জোর থাকিলে যেমন করিয়াই হউক, অনুকূল বায়ুর সাহায্যে অপর তীরে পৌঁছিতে পারিব। না পারি, এই মহাসমুদ্রের মহা আবর্ত্তের মধ্যেই ভাসিয়া বেড়াইব, তথাপি পঙ্কিলময় তীরে আর ফিরিয়া আসিব না।

যাই হোক্ মহাসমুদ্র পার হইবার জন্য আমার এই জীর্ণ জীবন-তরণীর যাবতীয় বন্ধন কাটিয়া দিয়া আমি অকুণ্ঠিত-চিত্তে প্রবল গাঙে গা ভাসাইয়া দিলাম। অন্তর্য্যামীর উদ্দেশে গাহিতে লাগিলাম,—

"আমার জীবন-তরী ভাসলো গাঙে নাইক কেহ ধ'রে হাল।
এমন সময় দয়া কর দীনবন্ধু! দীনদয়াল"॥

পাপ করিলেই যে পুণ্যের দরজা চিরতরে বন্ধ হইয়া যায় না, ইহা ধ্রুব-সত্য।

পাপ না থাকিলে পুণ্যকে কেহ চিনিত না। অন্ধকার আছে বলিয়াই তো আলোর এত বিকাশ! তেমনই পাপ আছে বলিয়াই পুণ্যের এত মাহাত্ম্য। মিথ্যা না থাকিলে সংসারে সত্যের আদর কখনই হইত না। রোগের জন্যই ঔষধ, শোকের জন্যই শান্তি, তেমনই পাপের পূতিগন্ধ নাসিকাগ্রে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যই পুণ্যের চরম প্রকাশ! দারুণ গ্রীষ্মের পর বর্ষার মতই পাপীর অন্তরে বাহিরে শান্তিবারি আনিয়া দিতে পারে পুণ্য!

যেমন জন্মের পর মৃত্যু ধ্রুব-সত্য, তেমনই পাপের পর অনুতাপও

চন্দ্র-সূর্য্য উদয়াস্তের মতই চির-নিশ্চিত। পাপ করিলেই অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে হইবে। এ অনলে কেহ বা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়, আর কেহ বা তরল হইয়া ময়লা মাটি ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্য ছাঁচে পরিবর্ত্তিত হয়। মহাপাপী রত্নাকরও একদিন এমনিতর ছাঁচে পরিবর্ত্তিত হইয়াই মহাকাব্য রামায়ণ রচনা করিয়া বাল্মিকী নামে চির পূজ্য ও চির অমর হইয়া আছেন।

প্রেমাবতার পরম কারুণিক শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট চেতনা পাইয়াই মহাপাপী জগাই মাধাইও একদিন পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং অমৃতপ্রসূ সুমধুর হরিনাম তাহাদের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল। এই চির শান্তি-প্রদ অনল, অনাদিকাল হইতে পাপীকে পোড়াইয়া পুণ্যাত্মা, অধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক, চোরকে সাধু এবং কৃপণকে দাতা করিতেছে। একদিন এই মহাসত্যের চির সুন্দর মর্ম্মার্থ আমার অন্তর-দুয়ারে অলক্ষিতে প্রবেশ করিবার পথ পাইয়াছিল। তাই আমার বিক্ষুব্ধ বিবেক আজ এই সর্ব্বগ্রাসী হুতাশনে তিলে তিলে দগ্ধ হইয়া যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতে করিতেও শীতল হইবার আশায়, ক্রমাগত এই অনল-সাগরেই ডুব দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

একদিন যেমন গোপনে চোরের ন্যায় অকরুণ সংসার হইতে বিদায় লইয়া আসিয়াছি, সেইরূপ এই নশ্বর পৃথিবী হইতে চুপি চুপি বিদায় লইবার পূর্ব্বে, এই চির অপরিচিতার জীবনজোড়া বেদনারবাণী আপনাদের শ্রীচরণ কমলে নিবেদন করিয়া যাইতে চাই। কিন্তু কেন চাই, জানেন কি?

যাহারা আমার কাছে আসিয়াছে, তাহারা কেবল আমার রূপ ও যৌবনের সংবাদ লইয়াই চলিয়া গিয়াছে। অন্য কিছুই জানে নাই বা

জানিতেও চাহে নাই। আমি যে কি ভীষণ অসহ্য মর্ম্মঘাতী বেদনার আগুন বুকে লইয়া দিন যাপন করিতেছি এবং প্রতি পলে-পলে অমানুষিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, সে যন্ত্রণায় সহানুভূতি দেখানো দূরের কথা, তাহার পূর্ব্ব ইতিহাসটুকুও কেহ কোনদিন জানিতে চাহে নাই। আজ তরঙ্গায়িত মরণ-সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া সত্যের অপলাপ করিব না। কেবল আপনিই শুধু দূর হইতে ধূম নির্গত হইতে দেখিয়া সে আগুনের সন্ধান করিয়াছিলেন এবং তাহা নির্ব্বাণ করিবার জন্য অযাচিত ভাবে করুণার এক বিন্দু বারি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। হায়! সময়ে সকলেই বন্ধু, অসময়ে কেহ নয়। সময়ে সকলই পাওয়া যায়, কিন্তু অসময়ে কিছুই কাছে মিলে না। নিদারুণ অভাবের দিনের দানই প্রকৃত দান! তাই আপনার দান আমি মাথা পাতিয়া লইয়াছি। আর যখনই লইয়াছি, তখন হইতেই এই অপরিচিতা দুঃখিনীর চির কলঙ্কিত বেদনা-ক্লিষ্ট মস্তক, আপনার চরণধূলির তলে নত হইয়া পড়িয়াছে! আপনার নিকট আমি অপরিচিতা এবং চিরকাল হয়তো অপরিচিতাই থাকিব, তথাপি অপরিচিত ভাবে থাকিয়াও, অতি সামান্য মাত্র পরিচয় দিয়া আমার এই দুঃসহ বেদনার কথঞ্চিৎ লাঘব করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

বিধির বিধানে এই পৃথিবীতে অন্য সকলে যেমন আসে তেমনি আমিও একদিন একলাই আসিয়াছি। অদৃষ্টবৈগুণ্যে সংসারের বাহিরে একান্ত নিভৃতে অপরিচিত ভাবে কাল যাপন করিতেছি; আবার একদিন এই-রূপ অপরিচিতা ভাবেই সকলের অগোচরে চুপিসারে বিদায় লইয়া নিতান্ত অপরিচিতার বেশেই কোন্ এক অপরিচিত দেশে চলিয়া যাইব। চলিয়া যাওয়ার সে তুচ্ছ সংবাদ কেহই রাখিবে না। যাহারা বাঁচিয়া থাকিতে

আদর করিত, মৃত্যু সংবাদ পাইলে তাহারাই হয়তো ঘৃণায় মুখ ফিরাইবে।

আমাকে প্রমীলা বলিয়া জানেন, তাহাই জানুন। বাস্তবিক প্রমীলা আমার নাম নয়। আমার প্রথম সংস্করণের অপর একটা নাম ছিল, প্রমীলা আমার দ্বিতীয় সংস্করণের নাম। বাপ মার দেওয়া মধুর সে প্রকৃত নাম আজ আবার কোন্ মুখে কিরূপে উচ্চারণ করি? যে তিন কুলে কালি দিয়া, কলঙ্ক পসরা মাথায় তুলিয়া চির হতভাগিনীর বেশ ধরিয়াছে; এখন সে কোন্ সাহসে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিতে বসিয়া লজ্জার মুখে পয়জার মারিতে মারিতে তিন কুলের মুখে লেপিয়া দেওয়া কালির উপরে নূতন করিয়া আবার বার্ণিশ ঘসিবে?

যাক্......আমার প্রকৃত নাম জানাইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইবেন না। আর নাম জানাইতে না পারিলেও জানিবেন, অন্য সকলেরই মত আমারও একদিন সব ছিল। কি জানি কেমন করিয়া নিয়তির চক্রে, কোথা হইতে এক সর্ব্বধ্বংসী দানব আসিয়া—ভীষণ ঝড় তুলিয়া আমার অতি সুখের ক্ষুদ্র নীড়টী ভাঙ্গিয়া, হাত ধরিয়া আমাকে দুর্গম পথের একাংশে বসাইয়া দিয়াছে।

তারপর শুধু আমাকে পথে বসাইয়া দিয়াই সে দুর্দ্দান্ত দানবের খলতার শান্তি হয় নাই, সে আমার মুখে চোখে— আমার সর্ব্বাঙ্গে বীভৎস পদাঘাত করিতেও ছাড়ে নাই! সেই দানবী-লীলার ঝড় থামিলে

দেখিলাম, দেহ আমার ক্ষত বিক্ষত, তদুপরি পথের চারিদিকে বিস্তৃত রহিয়াছে কণ্টকের আচ্ছাদন! সুখ-নীড়ের সদর দুয়ারও তখন আমারই চোখের সামনে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হায়! ফিরিবার জন্য আর কেহই ডাকিল না, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যে যেখানে ছিল সকলেই তর্জ্জনী দেখাইয়া শাসাইতে লাগিল, একবার যখন বাহিরে পড়িয়া গিয়াছ, তখন আর এখানে আসিতে দিব না। এখানকার আধুনিক নিয়ম—ভিতরে বসিয়া যাহা ইচ্ছা কর না কেন, তাহাতে এতটুকু দোষ হয় না, কিন্তু বাহিরে যাওয়া নিষেধ; শুধু নিষেধ নয়—মহা দোষ! ও-দোষের আর মার্জ্জনা নাই!

পথের মাঝে পতিতা একাকিনী এই অত্যাচারিতা নারীর পানে একজনও করুণার দৃষ্টি মেলিয়া চাহিল না। পথ তো পথিকবিহীন ছিল না,—কত নর, কত নারী, কত শত সুমহান বিরাট পুরুষ, কত সাধু-সজ্জন, কত সহস্র সমাজনেতা সেই পথ দিয়া আনাগোনা করিল,—কিন্তু হায়,—এ জন্মদুঃখিনীর পানে কেহই তাকাইয়া দেখিল না। যাহারা দেখিল, তাহারা বলিল, "আমরা যতদূর ভুল করি না কেন, তাতে যায় আসে না, কিন্তু তোমাদের মুহূর্ত্তের জন্য পদ স্খলিত হইলে আর উদ্ধারের এতটুকু আশা নাই। আমরা শত শত দোষ করি না কেন, তাহাতে কোনই দোষ নাই। কিন্তু তোমরা নিতান্ত অনিচ্ছায় একবার দোষ করিলেও তার মার্জ্জনা মিলিবার নিয়ম নাই"।

এইরূপে কেহ হাসিল, কেহ বা তীব্র ভৎর্সনা করিল, আর কেহ কেহ বা পেটের অন্ন হজম করিবার জন্য খোস-মেজাজে খোস গল্প করিয়া হাসিয়া খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু কতকগুলি সত্যকার

পরোপকারী লোক, যেন আমারই দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া গোটাকতক সোহাগের মিষ্ট কথা বলিয়া আমার কম্পিত তনুলতা ধরিয়া একদা আমাকে সেই কণ্টকাকীর্ণ পথ হইতে তুলিয়া যেখানে রাখিয়া গেল—আবেশমুদিত আঁখি মেলিয়া দেখি—হা মধুসূদন! এ যে দুর্গন্ধে ভরা অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর নর্দ্দমা!

এখানে না আছে আলো, না আছে বিশুদ্ধ বাতাস! এখানে আসল মানুষের আমদানি হয় না, দিবানিশি দানবে অট্ট অট্ট হাসে, পিশাচের পৈশাচিক নৃত্যকলায় এখানকার তুচ্ছ ধূলিকণাটুকুও আনন্দে ঢলিয়া পড়ে। এখানকার আলোকোজ্জ্বল প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুষ্ট কীট-কণ্টকিত কুসুমমালা পরিয়া ভস্মাবশেষ মদনদেব মনের আনন্দে ত্রাহি ত্রাহি চীৎকার করে!

আমি এক কথা বলিতে গিয়া অন্য কথা বলিতেছি বলিয়া মনে কিছু করিবেন না। কখনও কোনও দিন এ মর্ম্মঘাতী বেদনার বাণী কাহারও নিকট প্রকাশ করি নাই,—তাই বলিতে গিয়া অনভ্যস্তের মত এটার পর ওটা হইয়া হয়তো আমার মূল সূত্রের খেই হারাইয়া যাইতেছে!

২

নদীয়া জেলার কোন এক রেল ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পল্লীগ্রামে আমার জন্ম হয়। গ্রামটী বৃহৎ না হইলেও নিতান্ত ছোট ছিল না। পিতা মিত্রবংশ জাত কুলিন কায়স্থ। তাঁহায় খেতাব রায়। গ্রামের মধ্যে তাঁহার জরাজীর্ণ অর্দ্ধভগ্ন অট্টালিকা সর্ব্ব সাধারণের কাছে প্রমাণ করিয়া দিত যে, তিনি বনিয়াদি ঘরের সন্তান এবং এককালে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষের অবস্থা রাজার মতই স্বচ্ছল ছিল। বৃদ্ধ বয়সেও সুবিধা পাইলে এ কথা বলিতে তিনি গৌরব বোধ করিতেন। অবস্থা তাঁহার ভাল না থাকিলেও নিতান্ত অসচ্ছল ছিল না। জমি জায়গার আয় ও ত্রিশ টাকার সরকারী পেন্‌সনেতে সংসারের যাবতীয় ব্যয় এক প্রকার সুখেই চলিয়া যাইত।

আমার পিতা মাতার অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে আমি আর আমার দাদা ব্যতীত কেহই জীবিত ছিল না। সেই জন্য আমরা উভয়েই পিতা মাতার নিকট অতিরিক্ত আদর পাইতাম।

সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন যে, বাল্য-জীবনের মত এরূপ সরল সুন্দর মধুময় জীবন আর নাই। সে জীবন, শরতের ঊষার ন্যায় স্বচ্ছ সুন্দর বাসন্তী-সুষমা-সজ্জিত বনকুসুমের ন্যায় কোমল ও আনন্দদায়ক! আজ এই তরঙ্গসঙ্কুল বর্ত্তমানের কিনারায় দাঁড়াইয়া যখনই অতীতের কথা মনে হয়, তখনই শৈশবের সেই সুখস্মৃতি আমার মানস-চক্ষে ফুটিয়া উঠে। ইচ্ছা করে, এই পাপ-তাপ-বেদনা বিজড়িত অনুতাপ দগ্ধ তুচ্ছ

দেহটা দূরে ফেলিয়া দিয়া মুনিজন-বাঞ্ছিত নব কলেবর ধারণ করিয়া, স্নেহময়ী জননীর অসীম স্নেহের নীড়ে আবার আশ্রয় লই। যেঁ মহীয়সী দেবী আমার মুখের এতটুকু হাসি দেখিবার জন্য স্বর্গসুখও হেলায় ত্যাগ করিতে পারিতেন। যাঁর সুখ ছিল আমার সুখেই, যিনি আমারই দুঃখে অপারিসীম দুঃখ অনুভব করিতেন; হায়! একদিন এই হতভাগিনীর ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল করিবার জন্য সেই স্নেহময়ী জননীর কতই না আকাঙ্ক্ষা ও অবিরাম চেষ্টা ছিল।

মা! মা!! মা!!! মা শব্দ এত মধুর কেন? যতই বলি ততই বলিতে ইচ্ছা করে কেন? এই সুধামাখা মা শব্দ কোথায় ছিল? কবে মর্ত্ত্যে আসিল? অসহায় শিশুর করুণ ক্রন্দন শুনিয়া, ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া, আদ্যাশক্তি মহামায়া কবে মাতৃরূপে এ ধরাধামে অবতীর্ণা হইলেন? মার ভাণ্ডার অফুরন্ত, এত রত্ন কুবেরের ভাণ্ডারে নাই. বিশ্বপতি বিশ্বের ভাণ্ডারে যেখানে যেটী অমূল্য রত্ন পাইয়াছেন, যেখানে যেটী সাজে সেখানে সেইটী দিয়া মাকে আমার সাজাইয়াছেন। মার বিমল প্রেম, স্বচ্ছ মন্দাকিনীর ধারার ন্যায় স্বর্গ হইতে অবিরাম অশ্রান্ত ধারায় ঝরিয়া পড়িতেছে। মহাসমুদ্রের কিনারা আছে, কিন্তু মার ভালবাসার কূল কিনারা নাই, মাতৃস্নেহের সীমা নাই। মার স্নেহ ভালবাসা অফুরন্তসমুদ্র-সদৃশ উদার! জননীর জীবনব্যাপী কঠোর সাধনা অনন্য সাধারণ,—ইন্দ্রের আলোকোজ্জ্বল অমরাবতীর অপেক্ষাও শাশ্বত সুন্দর! অভ্রভেদী হিমাদ্রি হইতেও অনড় অটল! মহর্ষি বিশ্বামিত্র তপস্যাচ্যুত হইতে পারেন; শতসহস্র মহাযোগীর যোগ ভঙ্গ হইতে পারে; কিন্তু মার সাধনায় ত্রুটী হইবার উপায় নাই।

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

আজ কোথায় গো, স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার! তুমি সূতিকা-গারে কেন আমায় নুণ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলিলে না? তাহা হইলে তোমার জীবনব্যাপী দীর্ঘ সাধনা, অক্লান্ত পরিশ্রম, অফুরন্ত ভালবাসা— সকলই আজ ব্যর্থ হইত না। আমায় অতি শৈশবে মারিয়া ফেলিলে তো দেবীগর্ভে জন্ম লইয়া, এ কলঙ্ক-পসরা মাথায় তুলিয়া, আত্মীয়স্বজনের চির উন্নত শির অবনমিত করিয়া দিয়া আমি আজ কামুক স্বার্থসর্ব্বস্ব পিশাচের খেলার পুতলী হইতাম না। প্রকৃতি অংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, চির গৌরবময়ী মাতৃরূপ পরিত্যাগ করিয়া, স্নেহ-মায়া-মমতা-ভালবাসায় জলাঞ্জলী দিয়া, ঘৃণিত পিশাচের অঙ্কশায়িনী হইয়া কালযাপন করিতাম না।

কোথায় সমাজের আদর্শ গৃহিণী হইয়া সংসার-ধর্ম্ম পালন করিব, না হতভাগিনী চির কাঙ্গালিনী পথের ভিখারিণী সাজিয়া পথে পথে ঘুরিয়া মরিতেছি! সমাজ কোথায় গৃহলক্ষ্মী বলিয়া সাদরে বরণ করিয়া লইবে, না অসতী অলক্ষ্মী বলিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেছে। একি কম কষ্ট! এ যাতনা কি সহজে সহ্য করা যায়! কিন্তু সহ্য যে আমায় করিতেই হইবে। আমি যে স্বখাত সলিলে ঝাঁপ দিয়েছি,—অনুতাপ ব্যতীত আজ আমার শান্তি কোথায়?

বাবার যথেষ্ট সময় ছিল, তিনি যত্ন করিয়া আমাকে লেখা পড়াও শিখাইয়াছিলেন। দেখিতেও সুন্দরী ছিলাম, বয়সও হইয়াছিল। বাবা নানা জায়গা খোঁজ করিয়া, উপযুক্ত পণ দিয়া আমার স্বামী ক্রয় করিয়া

বিবাহ দিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট বিড়ম্বনায় বেশী দিন স্বামীর ঘরে বাস করিতে হইল না—এক বৎসরের মধ্যেই হাতের নোয়া, সিঁথির সিঁন্দূর ফেলিয়া দিয়া, সাদা থান পরিয়া, একদা শ্বশুর বাড়ী হইতে আমি বাপের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়ীতে পদার্পণ করিতে না করিতেই মা আমার অন্তরে বাহিরে তাঁর স্নেহের হস্ত বুলাইয়া দিলেন। তাঁহাকে স্পর্শ করিবামাত্র মনে হইল, যেন আমার সমস্ত দুঃখ কষ্ট কর্পূরের মত উড়িয়া গেছে। বাবাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম,—কয়েক মাসের মধ্যেই, তাঁর চুল যেন শণের মত সাদা হইয়া গিয়াছে। শরীরও অতিশয় রুগ্ন, সোজা হইয়া আর চলিতে পারেন না। কয়েক মাসের মধ্যেই দাদার বিবাহ হইয়া গেল। এই শুভ বিবাহে আমি কোন কার্য্যে যোগ-দান করিতে পারি নাই। দূর হইতে কেবল ছল-ছল, নেত্রে দেখিতে-ছিলাম; এবং যতদূর সম্ভব মার চোখের অন্তরালে থাকিতেছিলাম. কারণ, এই শুভ উৎসবে আমি যোগদান করিতে না পারায়, মা আমাকে দেখিলেই কাঁদিয়া ফেলিতেছিলেন।

শুভ কার্য্যে চোখের জল ফেলা অপেক্ষা দূরে থাকাই বুঝি অধিকতর শ্রেয়।

বৌদিকে দেখিলাম, আমারই সমবয়স্কা, দেখিতেও মন্দ নয়। মনে মনে ভাবিলাম, যাহা-হউক তবুও একজন সঙ্গিনী পাইলাম। মনের সমস্ত কথা না বলিতে পারিলেও, কথঞ্চিৎ বলিয়াও শান্তি পাইব।

প্রমীলার আত্ম কাহিনী

এখন মা ষষ্ঠীর কৃপায় দাদার আমার শীঘ্র একটী খোকা হউক, আমি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া আমার অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিয়া দিব।

অপরিমিত শোভাসম্ভার লইয়া শরৎ আসিয়াছে।

দিকে দিকে শারদীয় পূজার ধুম পড়িয়া গেছে।

পূজার পূর্ব্বে দাদা বৌদিকে তাঁর পিত্রালয় হইতে লইয়া আসিলেন। পূজার সুসজ্জিত উৎসব মণ্ডপে দাঁড়াইয়া আজ মনে হইল, অনেক দিন পরে নিরানন্দ ভবনে আজ অনন্দের বন্যা আসিয়াছে!

লক্ষ্য করিলাম, বৌদি নূতন প্রেমে বিভোরা, দাদাও তাই। বাবা বৃদ্ধ, তাহাতে বাড়ীর কর্ত্তা, কাজেই বাধ্য হইয়া নানা কার্য্যের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। অনুভবে বোধ হইল, মার শোকটাও অনেকটা নরম পড়িয়াছে; তবে যখনই তিনি আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন, তখনই মনে হইত আমার জন্য তিনি ব্যস্ততার মধ্যেও প্রতিনিয়ত অশান্তি ভোগ করেন; এবং আমার মুখের দিকে চাহিলেই তাহার সপ্ত তালু ভেদ করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হয়।

সত্যকথা বলিতে কি এতদিনে আমার মনটাও অনেকটা লঘু হইয়া গিয়াছিল; তবে যখন কোন বিষয়ে অতীত দিনের সহিত আমার বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করা হইত, যখনই প্রাণের মধ্যে একটা নিবিড় অশান্তি ও হাহাকার আসিয়া আমার সকল আনন্দ সকল উৎসাহ মুখে পর্ব্বত প্রমাণ বাধা আনিয়া দিত, নিমেষে আমি ম্লান হইয়া পড়িতাম, তখন চারিদিকের আবহাওয়া আমার নিকট দুষিত বোধ হইত। চাদে দেখিতে পাইতাম বিরাট কলঙ্করেখা, ফুলের বুকে পাইতাম বিকট পূতিগন্ধ!

বৌদি যে আবেগের সহিত তাঁহার নবানুরাগ বর্ণনা করিতেন, আমিও নিবিষ্ট মনে শুনিয়া যাইতাম। তাঁহার সুখে হিংসা না হইয়া আনন্দই হইত। সময়ে, সময়ে বৌদিকেও আমার মৃত স্বামীর প্রণয়ের কথা বলিতাম। তিনিও আগ্রহ সহকারে শুনিতেন, এবং বর্ত্তমান জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া লইতেন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে আমাদের দুই জনের মধ্যে বেশ একটু ভালবাসা জন্মিল। আমি তাঁহাকে সাধ্যমত নিত্য নূতন ভাবে সাজাইয়া দাদার ঘরে পাঠাইতাম, ইহাতে আমার মনে আনন্দ ব্যতীত অন্যভাব আসিত না।

মহাষষ্ঠীর দিন সকলে নূতন বস্ত্র পরিধান করিল। মার অনুরোধে আমাকেও পরিতে হইল, তবে বিধবার শুভ্রবেশ সাদা থান। কাপড় পরিতে গিয়া, কয়েক ফোঁটা চোখের জল মাটীতে পড়িয়া গেল। মনে পড়িল,—গত বৎসরের কথা। তখন পরিয়াছিলাম, রঙ্গিন রেশমী শাড়ী, রঙ বেরঙের সামিজ ব্লাউজ! আজ এক বৎসর পরে, হাঁ ভগবান,—পরিতেছি—এই সাদা থান! জীবনের রঙ্গিন নেশা আর নাই! এক বৎসরের মধ্যেই সব ফুরাইয়া গিয়াছে! পাঁচজনের মধ্যে থাকিতে হইলে, পাঁচ জনের মতই চলিতে হইবে। কথায় আছে, "আপ রুচি খানা, পর রুচি পড়না" নয়—আমার পরা এবং খাওয়া দুইই পরের রুচি অনুযায়ী হওয়া চাই, নতুবা সংসার ও সমাজ রসাতলে যাইবে!

সুখে দুঃখে পূজা কাটিয়া গেল।

বৌদির পিত্রালয়ে যাইবার সময় আসন্ন বিরহাশঙ্কায় আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, তিনিও পিত্রালয়ে যাইবার নিবিড় আনন্দের মধ্যেই আমার

মুখপানে চাহিয়া ছল্-ছল্ নেত্রে বলিলেন, "কেঁদনা ভাই! তোমার জন্মে বেশী দিন আমি বাপের বাড়ীতে আর থাকবো না। শীগ্গীর আমাকে এ বাড়ী আনবার ব্যবস্থা কোরো"।

আমি কোনই উত্তর দিতে পারিলাম না। উত্তর দিবার মত মুখে আমার ভাষা ছিল না, অন্তর নিয়ত পুড়িয়া যাইতেছিল!

৩

আজ কাল দেখা যায়, প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই একদল নিষ্কর্ম্মা যুবক আছে, যাহাদের কাজ হইতেছে অভিভাবকের অন্ন ধংস করা এবং অবশিষ্ট সময় থিয়েটার, যাত্রা বা তাসের আড্ডা সরগরম করিয়া রাখা। এই শ্রেণীর যুবকদের অন্তর নাকি কুসুমাদপি কোমল! পরের দুঃখ,—বিশেষতঃ তরুণী বিধবাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখে তাহাদের প্রাণ হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠে। শীস্ দিয়া গান গাহিয়া, ইসারা ইঙ্গিত করিয়া সততই তাহারা জানাইতে চায় তোমাদের কেউ না থাকিলেও আমরা আছি!

এ শুধু আমার শ্বশুর বাড়ীর গ্রামেই নয়; পিত্রালয়ে,—এই এখানেও দেখিতেছি পথে ঘাটে এই পল্লীরত্নদের অভাব নাই! যাহাদের সহিত আমার পূর্ব্বে কোন পরিচয় ছিল না, এখন দেখিতেছি পথে দেখা হইলে তাহারাই মুখপানে চাহিয়া মুচ্কি হাঁসিয়া, আমায় কত ভাবে কত রকমের কুৎসিৎ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আমি যত পাশ কাটাইয়া পলাইবার চেষ্টা করি, তাহারাও ততই অগ্রসর হইয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া

আমাকে বীভৎস প্রশ্ন-বাণে জর্জ্জরিত করিয়া তোলে। যে কোন প্রকারের ছল-ছুতায় আমাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়া দুই চারিটী কথা বলাই যেন তাহাদের মহৎ উদ্দেশ্য।

প্রথম প্রথম আমি একাই পুকুরঘাটে স্নান করিতে বা গা ধুইতে যাইতাম; কিন্তু ক্রমাগত গ্রামের ভবিষ্যৎ মুখোজ্জ্বলকারী যুবক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে এইরূপ সহানুভূতি পাওয়ায়, আমাকে বাধ্য হইয়া একাকী পুষ্করিণীতে যাওয়া বন্ধ করিতে হইল। মাও আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া, আর আমাকে পথে-ঘাটে কদাচ একা যাইতে অনুমতি দিতেন না।

এই যুবকদের কাহারও আমাদের বাড়ীতে আসিয়া কোন প্রকার আলাপ পরিচয় করিবার এতটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল না; কারণ আমার পিতামাতা দুই জনেই বড় কড়া মেজাজের লোক ছিলেন।

তরুণদলের কল্পনাময়-রঙিন্ মনের মধ্যে আমার মত হতভাগিনীদের জন্য পরোপকার প্রবৃত্তি প্রবল থাকিলেও, পঞ্জিকা-লিখিত মাহেন্দ্রক্ষণ বা অমৃতযোগের অভাবে তাহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইতে লাগিল।

যীশুখৃষ্ট যেমন পাপীকে ত্রাণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ তাহারাও আমাকে 'ত্রাণ' করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে উড়ো চিঠি লিখিয়া আমাকে 'সুসমাচার' জ্ঞাপন করাইত; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার দিক হইতে কোন উৎসাহ না পাইয়া, এই মহোপকারী মহামানবের দল সম্ভবতঃ আমার চির নরকবাস কল্পনা করিতে করিতেই অন্য দিকে অন্য কোনও সৎকার্য করিতে মনঃসংযোগ করিল। আমার প্রতি তাহাদের করুণা

সেই যে—শৃগালের 'দ্রাক্ষাফল অতিশয় টক্,—এইরূপ মন্তব্যের মতই আপনা আপনি অপসৃত হইয়া গেল।

প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ী হইতে চিঠি-পত্র পাইতাম। বড় জা'ই ভণিতা করিয়া লিখিতেন, 'মেয়েদের বিবাহ হইলেই আর বেশী দিন বাপের বাড়ী থাকা উচিত নয়। হাজার হউক শ্বশুরের ভিটা, এইখানেই তোমার পড়িয়া থাকা কর্ত্তব্য। ছেলেরা প্রত্যহই তোমার জন্য কাঁদে আমরাও সর্ব্বদা তোমার জন্য বড় ভাবিত থাকি।' ইত্যাদি—ইত্যাদি এইরূপ অনেক 'কাজের'ও 'সদুপদেশের' কথায় চিঠিগুলি পূর্ণ থাকিত।

মনে মনে ভাবিতাম, আমাকে লইয়া গেলে তোমাদেরই লাভ, বিশেষতঃ বড় জায়ের! সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভার আমার উপর চাপাইয়া দিয়া, নিজেরা দিব্য গায়ে হাওয়া লাগাইতে পারিবেন! অথচ কাজ-কর্ম্মের সময় পান হইতে চূণ খসিলেই আমার সর্ব্বনাশ!

বাপ মা আমাকে পাঠাইতেও নারাজ ছিলেন। আমার নিজের দিক হইতে এ-সম্বন্ধে কোন স্পৃহা ছিল না; বরং অন্তর আমার বিতৃষ্ণা ও ধিক্কারে ভরিয়া উঠিত। সেখানে কেনই বা যাইব? কিসের উপর আমার মমতা? শিবশূন্য কৈলাসে যাইতে কখন কাহারও ইচ্ছা হয়? আপনারাই বলুন না?

৪

বৈশাখ মাসের কাল বৈশাখীর ঝড়ের সঙ্গে আমাদের সংসারেও কাল ঝড় বহিয়া গেল।

পূর্ব্ব হইতেই বাবার শরীর ভাল ছিল না। হঠাৎ কয়েক দিনের জ্বরে ভুগিয়া আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া তিনি ইহ সংসার হইতে চির বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

দাদা ছেলেমানুষ, অপ্রত্যাশিতভাবে সমস্ত সংসারের দায়িত্ব তাঁরই উপর পড়ায় তিনি যেন কি রকম দিশাহারা হইয়া পড়িলেন। নিতান্ত অক্ষম বাঙলা দেশের নারী, আমরা আর কি করিব, দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় আমাদের সম্বল শুধু ক্রন্দনই। আমাদের সময় নাই অসময় নাই কেবল কাঁদিতে লাগিলাম।

বাবা মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে দাদাকে নিকটে ডাকিয়া আমার সম্বন্ধে অনেক উপদেশের কথা বলিলেন। যাহাতে আমি জীবনে কোনও দিন দুঃখ না পাই এমন কথাও তিনি দাদাকে জানাইলেন। বলিলেন, "আমি ত চল্লাম, আমার যাবার সময় হ'য়েছে, সুতরাং দুঃখ করে কোনো লাভ নাই। মৃত্যুকালে আমি অবশ্যই বিশ্বাস রেখে গেলাম যে—তোমার আদরের একমাত্র বোনকে কখনই তুমি ফেলবে না। আর বছর দুই বাঁচলে তোমাকে মানুষ করে দিয়ে যেতে পারতাম। তা যখন হইল না, তখন, নিজের বিবেচনায় যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবে সব

কাজেই যেন ভগবানের উপর বিশ্বাস রেখে চ'লো। আর সব চেয়ে বড় জিনিষ, নিজের চরিত্র কখনও নষ্ট ক'রো না, দেখ্‌বে সংসারে তুমি নিশ্চয়ই সুখী হবে।"

গ্রামের সত্যকার হিতৈষী যাঁরা, তাঁরা সকলেই দাদাকে পিতার শ্রাদ্ধ কার্য্য কোনও প্রকারে সমাধা করিতে বলিলেন। কিন্তু কিছুতেই দাদার তাহা মনঃপূত হইল না। গ্রামের মধ্যে বাবার যেরূপ খাতির-সম্মান ছিল, দাদা সেইরূপ ভাবেই তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন করিলেন। ইহার জন্য অবশ্য তাঁহাকে কিছু ঋণও করিতে হইল।

আমার বিবাহের সময় মা নিরাভরণা হইয়াছিলেন। বাড়ীতে পূর্ব্ব-সঞ্চিত অর্থও কিছু ছিল না। তা ছাড়া পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পেন্‌সেনের টাকাও বন্ধ হইয়া গেল। আমাদের বিষয়ের যাহা আয় ছিল, তাহাতে পল্লীগ্রামের মত জায়গায় রীতিমত ভদ্রভাবেই সংসার চলিতে পারিত। সুতরাং এ ভারটা আর দাদার স্কন্ধে পড়িল না।

সমস্যা উঠিল তাঁহার পড়ার খরচ লইয়া। তিনি বলিলেন "এই ক'মাস পরে বি, এ পরীক্ষাটা দিয়ে আর পড়বো না। দেখি সেখানে গিয়ে না হয় একটা ছেলে পড়ানো ঠিক ক'রে নেব।"

বৌদি আমাকে দিয়া দাদা ও মাকে জানাইলেন—'পড়ার ক্ষতি হইবে বলিয়া বাবা যখন ছেলে পড়াইতে দেন নি, তখন এই কয়েক মাসের জন্য আর সে কাজ করিবার প্রয়োজন নাই। আমার গহনা বিক্রয় করিয়া পড়ার খরচ চলিতে থাকুক। গহনা যাইলে আবার হইবে কিন্তু পড়িবার সময় চলিয়া গেলে আর তাহা ফিরিয়া আসিবে না।'

তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইলাম। দাদা বৌদির গহনা লইলেন না, বরং হাসিয়া বলিলেন, "দরকার হ'লে বাধ্য হয়ে নিতে হবে, তবে উপস্থিত দরকার নাই।"

৫

দিন কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। সময় আপনা-আপনি চলিতে লাগিল। বাবার মৃত্যুর শোকটাও বাড়ীতে অনেকটা উপশমিত হইয়া আসিল। দাদা বি, এ পরীক্ষা দিয়াই, কোনো এক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পদে চাকরি যোগাড় করিয়া লইলেন। এবং ইহারই কিছুদিন পরে পরীক্ষায় তিনি সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন—সংবাদ পাইলাম।

মা ও বৌদি কলিকাতা গিয়া দাদাকে এম, এ পড়িতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু দাদা বলিলেন, "আমি বাড়ীতে পড়িয়াই এম, এ দিব।"

যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে দাদা এম, এ পাশ করিয়া, কুষ্টিয়ার নিকট একটী উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে প্রথম শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

প্রথম প্রথম তিনি বিদেশে একা থাকিতেন, এবং নিজের বাসা খরচ বাদে বেতনের বাকী সমস্ত টাকাই মাকে পাঠাইয়া দিতেন। বিদ্যালয়ের ছুটী থাকিলে বাড়ীও আসিতেন। বৌদি বৎসরের বেশীর ভাগ সময়

আমাদের এইখানেই থাকিতেন। ইহারই মধ্যে তিনি আমাদিগকে একটী খোকা উপহার দিয়াছিলেন। খোকাবাবু দেখিতে অবিকল দাদার মতই সুন্দর হইয়াছিল। একথা বলাই বাহুল্য যে, খোকা বাড়ীশুদ্ধ সকলেরই অতি আদরের বস্তু হইয়াছিল।

কুষ্টিয়াতে দাদা স্থায়ীভাবে চাকরী গ্রহণ করাতে মা, বৌদি ও আমাকে দাদার বাসায় পাঠাইয়া দিলেন। স্নেহময়ী জননীর নিজের সন্তানের যাহাতে সুখ ও সুবিধা হয় তাহার দিকেই লক্ষ্য অধিক। বৌদির কোলে কচি ছেলে; সুতরাং আমাকে তাঁহার সঙ্গে দিলেন। কেননা, বৌদি সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকিলে তাঁহার সোহাগের নাতিটির কষ্ট হইবে!

দাদা ইহাতে আপত্তি করাতে মা বলিলেন, "আমার একলা থাকতে একটুও কষ্ট হবে না। তোরা যখন এখানে থাকবি না, তখন সংসারে কিসের কাজ? আর কি-ই বা কষ্ট? এক বেলা দুটী ভাত সিদ্ধ, আর এক বেলা ত সামান্য একটু জল খাওয়া। বাড়ীতে যে দুধ হবে তাই একা আমি খেয়ে উঠতে পারব না। আর যদি কখনো কঠিন অসুখ বিসুখ কিছু হ'য়ে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তোদের খবর দেব, তখন তোরা এসে পড়বি।"

দাদা মাকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু মা রাজী হইলেন না। তিনি বলিলেন, শেষ বয়সে, যেখান থেকে তিনি চলে গেছেন, আমিও সেইখান থেকেই যেতে চাই বাবা। তা'ছাড়া আমার শ্বশুরের ভিটেয় সন্ধ্যা-প্রদীপ দিতেও আমার থাকা প্রয়োজন। আমি না থাক্‌লে

তাদের যা কিছু আছে সবই যে নষ্ট হয়ে যাবে! বাবা, চাকরী তো চিরদিনের নয়। কিন্তু তোর এই পৈতৃক বাড়ী ও বিষয় সম্পত্তি চিরদিনের। ভগবান না করুন, চাকরী গেলেও, মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান থাকবে"।

দাদা এর উপর আর কোনও প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

আমরা সকলে একদিন মাহেন্দ্রযোগ দেখিয়া 'শ্রীদুর্গা' স্মরণ করিয়া রওনা হইলাম। কিন্তু হায়! সেই যাত্রাই আমার জীবনের শেষ যাত্রা হইয়াছিল। পঞ্জিকার শুভক্ষণ অদৃষ্টদোষে অশুভক্ষণে পরিণত হইয়াছিল।

যাইবার সময় দেখলাম, স্নেহময়ী জননী আমার দরজার কাছে ম্লানমুখে দাঁড়াইয়া আছেন। স্নেহের নয়নাশ্রু অতিকষ্টে রোধ করিবার জন্য বারংবার অঞ্চল দিয়া মুখ মুছিতেছেন। তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই আমি ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। মনে হইল মায়ের সহিত এই বুঝি আমার শেষ দেখা।

দাদা আদর করিয়া মাথায় হাত দিয়া সস্নেহে বলিলেন, "এই ত ক'মাস পরেই পূজোর ছুটী, তখন আবার আমরা বাড়ী আস্‌ব।"

বৌদি সত্যসত্যই আনন্দময়ী ছিলেন। দেখিলেই বোধ হইতেছিল তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত আনন্দ, মুখ চোখ দিয়া ফুটিয়া বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। হইবারই ত কথা, এমন সকল মেয়ে মানুষেরই হয়; আজ তিনি তাঁহার জীবনানন্দের সহিত সর্ব্ব প্রথম প্রবাস বাসে

যাইতেছেন। সেখানে তাঁহার কাছেই থাকিবেন। যখন ইচ্ছা তখন দেখিবেন বা কথা বলিতে পারিবেন। নিজের সংসারে স্বাধীন গৃহিণী হইবেন। লজ্জা বা পরাধীনতার বালাই থাকিবে না। যখন যাহা মনে উদয় হইবে, তখনই তাহা স্বামীকে বলিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন। প্রত্যেক নারীই চায় যে, সে তাহার নিজের সংসারে নিজেই কর্ত্রী হয়। নিজের হাতে স্বামী পুত্রকে যত্ন করে, নিজের হাতে পরিবেশন করিয়া তাহাদিগকে কাছে বসিয়া খাওয়ায়! নিজের ধন-কড়ি নিজ হাতে খরচ করিয়া নারী জীবনকে সার্থক করে।

আমার বৌদিরও নিজের সংসারে এই প্রথম অভিযান, এ অভিযানে আনন্দ ব্যতীত মনে তাহার অন্য কিছুই উদয় হইবার কথা নয়। যথা সময়ে আমরা দাদার কর্ম্ম-স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

৬

গ্রামের বাহিরে বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের নিকটেই আমাদের বাসা। চালার ঘর, ছেঁচার বেড়া। আশে-পাশে অনেকটা জায়গা ছিল, দাদা বলিলেন, "সামনে ফুলগাছ ও পেছনে শাক শব্‌জি লাগিয়ে দেব।"

আমাদের বাসার পিছনেই চাষের জমি। অধিকাংশ জমিতে পাটের চাষ হয়।

আমাদের নূতন সংসার পাতিতে প্রথম প্রথম কিছু কষ্ট হইল, পরে সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গেল।

গ্রামটী মুসলমান-প্রধান, জমিদারও মুসলমান এবং ওই গ্রামেই বাস। তথাপি হিন্দুরা বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। গ্রামের সকলেই দাদাকে সম্মান করিত। দাদার বেতন ছাড়াও দুই তিনটি ছাত্র বাড়ীতে 'প্রাইভেট্' পড়িতে আসিত বলিয়া আরও কিছু তাঁহার উপার্জ্জন হইত। পল্লী-গ্রামের খরচ বড় একটা বেশী নয়। তাহার উপর গ্রামের সাধারণ গৃহস্থের বাড়ীতে কোন তরি-তরকারি হইলেই "হেড্ মাষ্টারের" বাসায় না দিয়া তাহারা খাইত না। সুতরাং জ্বালানী কাঠ তরকারি প্রভৃতি আমাদের ক্রয় করিতে হইত না। দাদা একটী ঝি রাখিয়াছিলেন। তাহার বেতনও সামান্য ছিল। সুতরাং বাসা-খরচ বাদে মাসে মাসে দাদার অনেক টাকা বাঁচিয়া যাইত। তিনি খরচ বাদে যাহা বাঁচিত সবই মাকে পাঠাইয়া দিতেন।

মা প্রায়ই এত বেশী টাকা পাঠাইতে নিষেধ করিয়া পত্র দিতেন। লিখিতেন যে, "আমি একলা মানুষ, এখানে যা পাওয়া যায়, তাই খেয়ে উঠ্‌তে পারি না। তোমাদের কষ্ট করে টাকা পাঠাবার দরকার নাই।"

দাদা কিন্তু তাহা শুনিতেন না। নিয়মিতভাবে মায়ের নামে প্রতি মাসে মণি-অর্ডার করিতেন।

বৌদি একদিন অনুযোগ করিয়াছিলেন যে, "নিষেধ সত্ত্বেও অনর্থক পাঠাইয়া লাভ কি?"

দাদা হাসিয়া বলিয়াছিলেন, "যা পাঠাব তাই আমার ভবিষ্যতের জন্য জমা থাক্‌বে, এবং মাও খুসী হবেন। তা'ছাড়া আমার হাতে থাক্‌লে সবই খরচ হ'য়ে যাবে। সকলেই ত ভবিষ্যতের জন্য কিছু কিছু রাখতে চায়।"

বৌদি, এ-কথা বলার পরে আর কিছুই দাদাকে বলতেন না।

এখানে আসিয়া সংসারের যাবতীয় কাজই আমার উপর আসিয়া পড়িল। সকালে আমাকে নিজের জন্যে নিরামিষ রান্না করিতেই হইবে, তাহার উপর দুটী সিদ্ধ চাউল ফোটাইবার জন্য আর বৌদিকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা হইত না। রাত্রের রান্না বেশী কিছু ছিল না। মাছ থাকিলে মাছের ঝোল ভাত, নতুবা ভাত-ডাল আর একটা তরকারি। বৌদির কোলে ছেলে, কাজেই এ বেলাটাও আমি রাঁধিতাম। তবে দয়াপরবশ হ'য়ে অথবা লোক নিন্দার ভয়ে একাদশীর দিন দুই বেলাই

বৌদি রাঁধিতেন। রান্না ব্যতীত সংসারের অন্যান্য কাজও আমাকে দেখিতে হইত। কারণ বৌদির কচি ছেলে কোলে, তার উপর তিনি স্বামীর প্রেমে মসগুল্! তাঁর সংসারের ঝঞ্ঝাটে থাকিবার মত স্বচ্ছল অবসর মোটেই ছিল না।

কিন্তু অবসর না থাকিলেও, মাঝে মাঝে বৌদি আমাকে এক এক-বার নাড়া দিয়া বোঝাইয়া দিতেন যে, তিনিই সংসারের কর্ত্রী। আমি পরগাছা মাত্র। সুতরাং আমার অদূরদর্শিতার জন্য যেন জিনিস-পত্রের বেশী কিছু অপচয় না ঘটে!

৭

দু'মাস পরের কথা.........

আমি যে ভ্রাতার অন্ন বস্ত্র প্রত্যাশী এক যুবতী বালবিধবা, এ-কথা পূর্ব্বেই গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে এবং আমাকে ভ্রাতৃ-কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কেহ কেহ যে সে চেষ্টা করিতেছেন তাহাও তাঁহাদের কার্য্য-কলাপে বেশ বুঝিতে পারিলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার দাদার নিকট কয়েকটী ছেলে প্রাইভেট্ পড়িতে আসিত। বিদ্যালয়ের অন্য অন্য ছাত্ররা প্রয়োজন বশতঃ সময়ে সময়ে আসিলেও, বাহিরে থাকিত। কিন্তু ইহারা প্রত্যহ আসিত বলিয়া, দরকার হইলে বাড়ীর মধ্যেও যাতায়াত করিত। যদিও দাদার ছাত্র, সম্পর্কে—আমাদের পুত্র-স্থানীয়, তথাপি বৌদি 'বৌ মানুষ' বলিয়া

তাহাদের সহিত কথা বলিতেন না। আমি বাড়ীর মেয়ে, কাজেই আমাকে সামনে বাহির হইতে হইত এবং প্রয়োজন হইলে, কথাও তাহাদের সহিত বলিতে হইত।

প্রথম প্রথম আমি সরল ভাবেই কথাবার্ত্তা কহিতাম। কিন্তু পরে লক্ষ্য করিলাম, তাহাদের মধ্যে একজন আমার সহিত ঘনিষ্ঠতা পাতাইবার বিশেষ চেষ্টা করিতেছে। দেখিতাম, সে প্রায়ই একটা না একটা ছুতা নাতা করিয়া বাড়ীর মধ্যে আসিত এবং সুবিধা পাইলেই, বিবিধ প্রকারে গৌরচন্দ্রিকা করিয়া, হাঁসিয়া হাঁসিয়া আমার সহিত কথা বলিত। এমনি ভাবে দিনকয়েক অতিবাহিত হইলে, একদিন উক্ত ছাত্রটি আমার সহিত একটুখানি রসিকতা করাতে, আমি বেশ কড়াভাবে তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম যে, "তোমরা আমার দাদার ছাত্র, সুতরাং আমাদের পুত্র-স্থানীয়। বিশেষতঃ তোমরা ভদ্রলোকের ছেলে, বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছ, কি ভাবে মেয়েদের সহিত কথা বলিতে হয়, এটা জানা তোমাদের উচিত।"

যাহা হউক ইহার পর হইতে আর কোন উপদ্রবের আভাষ পাই নাই।

স্থানীয় একটী চাষার মেয়ে আমাদের বাসাতে পরিচারিকার কাজ করিত। কিছু দিন পরে বুঝিলাম, সে নানাভাবে, গ্রামের একজন অবস্থাপন্ন গৃহস্থের, এক চরিত্রহীন পুত্রের প্রতি আমার মন আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। একদিন সে জানাইল যে, বাবুর ছেলে আমাকে নাকি হঠাৎ একদিন দেখিয়া, আমার রূপে মোহিত হইয়া

পড়িয়াছে। আমাকে না পাইলে সে নাকি প্রাণে বাঁচিবে না। ইহ সংসারে সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তি বলিতে যা কিছু আছে সবই তাহার একমাত্র আমারই সম্মতির উপর নির্ভর করিতেছে। আমার অভাবে ধনীর দুলাল হয়তো বা ভবিষ্যতে উন্মাদ হইয়া অথবা বিবাগী হইয়া গৃহত্যাগ করে। আমাকে কাছে পাইলেই সে তৎক্ষণাৎ কলিকাতা লইয়া গিয়া বিধবামতে বিবাহ করিয়া সোনা দানা দিয়া আমাকে রাজ-রাণী করিয়া রাখিবে।

প্রথম প্রথম এই সব বাজে কথায় কাণ দিতাম না, অথবা কাণ দিয়েও, হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। মনে মনে ভাবিতাম, এই ঝি মাগীটার নিশ্চয়ই মাথার একটু ছিট্ আছে।

কিন্তু যখন সে একদিন একখানা চিঠি আনিয়া উপস্থিত করিল, তখন আমার অত্যন্ত রাগ হইল। আমি এতদিন পরে সত্য সত্যই ধৈর্য্য-হারাইলাম। ঝি-রূপী দূতিকে সেই দিনই তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলাম। তাহার স্থানে অন্য ঝি বাহাল হইল। আমি এইবার বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, এ গ্রামেরও জনকতক চরিত্র-হীন যুবক আমার পিছনে লাগিয়াছে। আমি বিশেষ সাবধানে থাকিতে লাগিলাম। তদবধি বিশেষ প্রয়োজন হইলেও বাড়ীর বাহিরে আসিতাম না। কিন্তু বিপদ যখন আসে, তখন চারিদিক হইতেই আসে। যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেও কোনো ফল হয় না।

৮

পূজার আর বেশী দেরী নাই। শীঘ্রই বিদ্যালয় বন্ধ হইবে। মনের মধ্যে আনন্দের জোয়ার আসিয়াছে...আবার বাড়ী যাইব। আবার আমার স্নেহময়ী মার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার অফুরন্ত স্নেহ ভালবাসার মধ্যে ডুবিয়া থাকিব। এইরূপ কত কি জল্পনা-কল্পনা করিতেছি, এমন সময় পোড়া বরাতের গুণে আমার অদৃষ্টচক্র বিপরীত দিকে ঘুরিয়া গেল।

চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি, মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন অন্য! লোকে বলে ইহাই নাকি সৃষ্টিরক্ষার সনাতন নিয়ম!

সেদিনকার রাত্রিটা ছিল নিছক কালো অন্ধকার! আমার জীবনে এমন প্রলয়ঙ্করী রজনী কখনো চোখে পড়ে নাই! উঃ...মনে পড়িলে আজও আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে! দেহের যাবতীয় শিরা-উপশিরা ও ধমনীর রক্ত নিমেষে হিম হইয়া যায়। কি সে প্রলয়! মেঘের গুরুগম্ভীর গর্জ্জনের তালে তালে বিজলীর টিট্‌কারীর হাসি, আর শ্রাবণের অশ্রান্ত ধারার ন্যায় অবিরাম বর্ষণ! পৃথিবী বুঝি প্রলয় পয়োধি জলে নিমজ্জিত হইয়া যাইবে আজ!

রাত্রি তখন বারোটা আন্দাজ হইবে। আমি সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রমের পর আপন অদৃষ্টচিন্তা করিতে করিতে একসময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, ও বৌদি পাশের ঘরে অকাতরে ঘুমাইতেছেন। এমন-সময় কাহার আকস্মিক স্পর্শে আমার স্বপ্নময় তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। অনুমানে

বুঝিলাম আমার ঘরে তিন চারি জন লোক প্রবেশ করিয়াছে। তাহারা আমার মুখে রুমাল দিয়া বেশ শক্ত করিয়া মুখ, হাত ও পা বাঁধিয়া ফেলিল। চীৎকার করিবার উপায় নাই, তথাপি প্রাণপণে আমি হাত পা ছুঁড়িবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তাহাদের দানবী শক্তির সহিত দুর্ব্বল নারী আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। আততায়ীরা আমাকে কাঁধে করিয়া তুলিয়া লইয়া বাড়ীর পিছনে বিস্তীর্ণ পাটক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলাম না, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ থাকা সত্ত্বেও, তাহারা কি করিয়া আমার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তবে ইহা বুঝিতে পারিলাম যে, আমি পিশাচের হস্তে পড়িয়াছি। তাহারা আমার নারী জীবনের সর্ব্বস্ব হরণ না করিয়া ছাড়িবে না! তাহারা তো অর্থের জন্য আমাকে হরণ করে নাই, করিয়াছে কাল এই যৌবনের জন্য। এই পোড়া যৌবন যদি না থাকিত, তাহা হইলে কখনই আমি এই কামুক পিশাচের হস্তে পড়িয়া এত দূর হীন লাঞ্ছনা ভোগ করিতাম না! বাঙ্গলাদেশে বিধবা হওয়া যে কত বড় অভিশাপ, তাহা এতদিনে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতে পারিলাম! হা মধুসূদন! বাংলার বিধবারা বুঝি যে কোনও প্রকারের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিতেই সুজলা-সুফলা শস্য শ্যামলা মা বঙ্গভূমির কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে!

তাহারা আমাকে কিছুদূরে লইয়া গিয়া, ক্ষেতের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা দেখিয়া নামাইল।

অনুমানে বুঝিলাম, একজন লোক পকেট হইতে দেশলাই বাহির করিয়া ক্ষুদ্র একটি মশাল জ্বালিল। সেই মশালের মিটি-মিটি আলোতে আমি

দেখিলাম, অপরিচ্ছন্ন পাট-ক্ষেতের জঙ্গলে স্বয়ং গ্রামের মুসলমান জমিদার-পুত্র সুসজ্জিত বেশে দণ্ডায়মান ! এবং তাহারই নিকটে হিন্দু কুলাঙ্গার চরিত্রহীন সেই যুবক, যে আমার দাদার নিকট প্রাইভেট্ পড়িতে আসিত এবং সময় ও সুযোগ পাইলেই আমার সহিত হাসি-তামাসা করিবার চেষ্টা পাইত। ইনিই, এই শান্ত সুশীল ও সুবোধ ছাত্রটিই গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ একদা ঝি দ্বারা আমাকে 'পত্রোপহার' দিয়াছিলেন। যাহারা আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল তাহারা সকলেই মুসলমান

অবশ্য এ কথা না বলিলে আজ ভগবানের কাছে আমায় অপরাধী হইতে হইবে যে, মুসলমানে ধরিয়া আনিলেও, ধৃত করিবার যাবতীয় ছল-কৌশল শিখাইয়া দিয়াছিল আমার দাদার সেই হিন্দু ছাত্রটি। মন্ত্রণাদানে হিন্দুরা চিরদিনই তৎপর ! সে ভালোই হোক আর মন্দই হোক। স্বজাতি হইয়া স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিতে হিন্দুরাই বেশী ওস্তাদ ! নতুবা আজ মুসলমান-প্রধান গ্রাম হইলেও অসূর্য্যম্পশ্যা নারীর ন্যায় বাস করিতে করিতে মুসলমানের সাধ্য কি—আমার মুখ দর্শন করে ! হোক না সে ধনীর দুলাল—জমিদারের প্রিয়তম পুত্র !

মুসলমান জমিদার-পুত্র হাসিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "সুন্দরী তোমার ভালর জন্যই তোমাকে কষ্ট দিলাম বলে মনে কিছু ক'রো না। তোমার মত এমন বেহেস্তের পরী, জঙ্গলে না প'ড়ে থেকে, আমার মত রসিক নাগরের কণ্ঠেই মানাবে ভালো। আমি তোমাকে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত ক'রে নিকা করব। তোমাকে পেলে আমার শুক্‌নো মালঞ্চে ফুল ফুটবে। জীবন আমার ধন্য হবে।"

এই বলিয়া আদর করিয়া জমিদার-কুলকলঙ্ক হাসিতে হাসিতে আমার গালে টোকা দিল!

উঃ কি যে যন্ত্রণা,! যম-যন্ত্রণা কেমন তা জানি না, তবে এ-যাতণার কাছে যে নিতান্তই তুচ্ছ, তাহা আমি আজ তেত্রিশ কোটী দেবতার শপথ করিয়া বড় গলায় বলিতে পারি।

৯

আমার মুখ-হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই, একটা পাল্‌কীর মধ্যে পুরিয়া, দুষমনের দল পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। ঘণ্টাখানেক পরে, অন্য এক গ্রামের এক বাড়ীতে একটী ঘরের মধ্যে আমাকে পুরিয়া, তালা বন্ধ করিয়া তাহারা চলিয়া গেলে আমি বেশ বুঝিলাম, কোনো এক অজ্ঞাত পল্লীতে নিতান্ত অচেনা জায়গায় আমি বন্দিনী থাকিলাম।

কাল রাত্রি প্রভাত হইল। অগ অন্য দিনের মত আজো জবাকুসুম সঙ্কাশ সূর্য্যদেব উদয়াচল আলো করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বনস্পতির শীর্ষে, কাননে-কান্তারে প্রভাত-বন্দনা সুরু হইয়া গেল। গতানুগতিক নিয়ম অনুসারে দুনিয়া যেমন চলে তেমনি চলিল। কেবল মা বসুন্ধরার বুকে, গত রাত্রে যে মর্ম্মান্তিক এক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে হতভাগিনীর ভাগ্যদোষে হয়তো তাহারই সন্ধান কেহ রাখিল না। শিশুর স্তন্য পানের

ন্যায় কতকগুলি শয়তান যে নররূপ ধরিয়াও রাক্ষসের ন্যায় নারী রক্ত পান করিল—তাহাই শুধু লোকচক্ষুর অগোচরে রহিয়া গেল। ইহারই নাম বিধি-বিড়ম্বনা!

ফতিমা নামক একটি স্ত্রীলোক আমার বদ্ধ ঘরের দুয়ার খুলিয়া নিকটে আসিয়া আমার মুখের, হাতের ও পায়ের বাঁধন খুলিয়া দিয়া বলিল, "বহিন, কি আর ক'রবে, কপালে যা ছিল তাই হ'ল। তবে তোমার পক্ষে সবচেয়ে সুখের কথা,—যারা তোমায় ধরে এনেছে, তারা হিন্দু নয়। হিন্দুদের খবর তো জানো, ভাই, ওরা কুলের কুলবধূকে, কুলের বাইরে এনে, দিন কতক ধূমধামের সঙ্গে তাদের রূপ যৌবন লুটে নিয়ে, পরে ভালো না লাগলেই অকূলে ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু যারা তোমায় এনেছে, তারা হিন্দু পাষণ্ডদের মত নিমকহারাম নয়। এরা তোমায় নিজেদের কাছে কাছে রাখবে। আর পাঁচজনের মত তোমাকেও সমাজে ঠাঁই দেবে। শুধু তাই নয়, তোমার পেটের ছেলে-মেয়েরাও জায়গা পাবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এমনতর করার মানে? কেন?"

ফতিমা বলিল, "কতকগুলো বেইমান্ পাষণ্ড আছে, যারা কেবল রূপ-যৌবন ভোগ করবার জন্যেই মেয়েমানুষদের চুরি ক'রে আনে। আর কতকগুলো লোক আছে, যারা সত্যি সত্যিই সাদি করবে বলে, তারা ছলে বলে কৌশলে যেমন করে হোক মেয়েমানুষদের চুরি করে আনবেই। মুসলমান সমাজের মধ্যে পুরুষ হিসাবে মেয়েদের সংখ্যা কম। তার উপর

যা'দের অবস্থা ভাল, ইচ্ছে করলে তারা একটা কেন, দুটো তিনটেও বিয়ে করতে পারে। অনেকে তা করেও থাকে।

আমি বলিলাম, "যে-সব হিঁদুর মেয়েরা আসে, মুসলমানের সংসারে তাদের থাকতে রুচি হয় ত?"

ফতিমা বলিল, "রুচি না হ'লে আর উপায় কি? যারা আসে, তাদের কতকটা বাধ্য হয়েই থাকতে হয়। তার কারণ, তাদের তো আর ফিরে যাবার উপায় থাকে না! মুসলমান সংসারে মুসলমানী সেজেই, কাল কাটাতে হয়। সেখানকার চাল চলনেও অভ্যস্ত হ'তে হয়। তারপর ছেলে মেয়ে হলে পুরো সংসারী হয়ে পড়ে। হাতে-হাতে প্রমাণ এই আমাকেই দেখ না, আজ ক'বছরের ভেতর কি হয়ে গেছি! এখন নিজের কথা মনে হলে নিজেই অবাক্ হয়ে যাই"

আমি বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলাম। এখন আর ফতিমার সহিত নিতান্ত সাধারণ নারীর মত ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইল না। কতকটা সম্ভ্রমের সুরে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাই নাকি! আপনিও হিন্দুর মেয়ে? এখন দেখলে বোধ হয় যে আপনি খাঁটি মুসলমানী। আপনি কি ক'রে এদের সমাজে এলেন?"

তিনি বলিলেন, "শুধু আমি নই বোন্। এই গ্রামেই খোঁজ করলে আরও অনেকগুলি হিন্দুর মেয়ে পাবে, যারা বাধ্য হয়ে মুসলমানী হয়েছে। শুধু আমাদের এই গ্রামটী নয়, বাংলার আরও কত শত গ্রাম হ'তে, কত শত হিন্দু নারী যে হিন্দুসমাজ থেকে নির্য্যাতিত হ'য়ে মুসলমান সমাজে এসে পড়েছে তার খোঁজ কে রাখে? যাদের সংসার হ'তে কোন নারী অপহৃতা হয়; তারা কিল খেয়ে কিল হজম ক'রে ব'সে থাকে। বর্ত্তমান

হিন্দু-সমাজের অবস্থা এতই হীন যে, এই সব অন্যায় অত্যাচার নিবারণ করবার মত কোনও ক্ষমতাই তার নেই। শুধু ক্ষমতা কেন—চেষ্টা পর্য্যন্ত তারা করে না। দেশে দেশে হিন্দু-যুবারা দেশ উদ্ধারের জন্যে বুক ফুলিয়ে জেলে যায়, সাহস করে পুলিসের বন্দুকের গুলি খেতে এগিয়ে আসে, না খেয়ে দিনের পর দিন উপোস করে জান্ খোয়ায়,—কোনও বিষয়ে তারা পেছ্-পা নয়। তারাও আজ বোবা হ'য়ে আছে শুধু আপনার সমাজের কাছে। এতবড় একটা জাতি সমূলে ধ্বংস হ'তে চ'লেছে,—নারীর লাঞ্ছনায়, নির্য্যাতিতার চোখের জলে বাঙ্গলার নদী-নালা পর্য্যন্ত কানায় কানায় ভরে উঠেছে—তবু বাঙ্গলার হিন্দু যুবাদের এতটুকু খেয়াল নেই। তারা যেন ঘুমিয়ে প'ড়েছে! যেমন তেমন ঘুম নয় অবিকল যেন কুম্ভকর্ণের নিদ্রা!

সংসারে সকলের যেমন থাকে, আমারও ভাই তেমনি সব ছিল; কিন্তু একদিনের সামান্য ত্রুটীর জন্যে সব আমি হারিয়েছি! আমার স্বামী, পুত্র, কন্যা, বাবা, মা, শ্বাশুড়ী, দেবর এখনও সব্বাই বেঁচে আছে। মেয়ে মানুষে যা কিছু বাঞ্ছা করে, তার সবই আমার থাকা সত্বেও, কপালের দোষে, আর সমাজের শাসনে আজ হিন্দুর মেয়ে হয়েও, আমাকে মুসলমানের ঘরে ঘর করতে হচ্ছে! এ কি কম কষ্ট ভাই? প্রথম প্রথম খুবই কষ্ট হত। মা হয়ে নিজের সন্তান ত্যাগ করা, সে যে কি নিদারুণ কষ্ট, যে করেছে সেই জানে! তারা থেকেও আজ নাই। প্রথম প্রথম এ সব কথা মনে হ'লে বুক ফেটে যেত। কাপুরুষ হিন্দু সমাজকে অভিশাপ দিতাম। কিন্তু এখন আর তা দিইনে। দিইনে শুধু এই ভেবে, যে, মনুষ্যত্বহীন যে, তার কাছে কতটুকু আশা আমরা করবো?

অন্ধকে কমললোচন বললে নিজেরই লজ্জা আসে। অন্ধের কিছুমাত্র লাভ লোকসান হয় না। যে বধির, তার কাণের গোড়ায় লক্ষ ঢাকের আওয়াজ হলেও, হয় তো সে কাণে করবে না। অরণ্যে রোদন ক'রে লাভ নেই বোন্। আমার মতে বর্ত্তমানকে মানিয়ে নিয়ে, কোনও রকমে বেঁচে থাকাই হচ্ছে বাহাদুরী। ম'রলেই তো সব ফুরিয়ে গেল! সহ্য না হ'লেও সহ্য করতে হবে। নতুবা দোসরা পথ তুমি পাবে কোথায়?

১৷

আমার ঐকান্তিক অনুরোধে, ফতিমাবিবি তাঁর নির্য্যাতনের ইতিহাস সংক্ষেপে বলিতে লাগিলেন।

—"আমার শ্বশুরবাড়ী এই পাশের গাঁয়ে। বাপের বাড়ী এখান থেকে দশ বারো মাইল তফাতে। আমার সঙ্গে শ্বাশুড়ীর খুঁটী-নাটী নিয়ে প্রায়ই ঝগড়া হত। স্বামী আমাকে যথেষ্ট ভালবাসতেন, কিন্তু শ্বাশুড়ীর ভয়ে বাইরে কিছু বলতে পারতেন না। আমার তখন একটী ছেলে ও একটী মেয়ে। শ্বাশুড়ী তাদের খুবই ভালবাসতেন, এবং আমার সঙ্গে তাঁর ঝগড়ার কারণই হ'লো এই ছেলে মেয়ের ব্যাপার নিয়ে। কথায় কথায় তিনি ব'লতেন,—মায়ের দোষে ছেলে-মেয়েরা অযত্নে মারা যাবে। রাক্ষুসী মা, আপন পেটের ছেলের যত্ন জানে না, সংসারে এমন অপয়া বউ-ও তো বাপু সাতজন্মে দেখিনি কারুর। পেটের ছেলের যত্ন ক'রে না! এমনি কত কথা! আমার ভাই শুনে শুনে বড় রাগ হ'ত। আমি মা,

আমি কি সত্যই আপন ছেলের অযত্ন করতে পারি? কিন্তু আমার অবুঝ শাশুড়ী কিছুতেই তা বুঝতেন না। কোলের মেয়েটী দামাল হয়েছিল। হঠাৎ একদিন হামা দিতে দিতে খাট হতে পড়ে গেল। এই নিয়ে শাশুড়ী সেদিন এমন কাণ্ড বাধালেন যে, আমাকে বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে দু'চার কথা মুখোমুখী ব'লতে হল সত্যিই আমার খুব অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল। ফলে, শাশুড়ী তখুনি গরুর গাড়ী এনে, ছেলে মেয়েকে নিজের কাছে রেখে দিয়ে, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। যাবার সময় স্বামীকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি বল্লেন, 'বেশ ত, দু'দিন বাপের বাড়ী বেড়িয়ে এস না। মা আর ক'দিন কচি-কচি ছেলে-মেয়ে মানুষ করতে পারবেন! দু'দিন পরে রাগ থামলে আবার তিনি নিজেই তোমাকে নিয়ে আসবেন'

—"আমি আর কোন কথাই বল্লাম না। বাড়ীর একটা কুকুর পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে গেল না। কেবল বাড়ীর গাড়োয়ানের সঙ্গে পাড়ারই একটা নীচ জাতের মেয়েকে আমার সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। আমার কিন্তু বেজায় রাগ হ'য়েছিল, ভাই। ঝি ধরণের নীচ জাতের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে, অনেকবার, বাপের বাড়ী হতে শ্বশুরবাড়ী, শ্বশুর-বাড়ী হতে বাপের বাড়ী যাওয়া আসা করেছি; কিন্তু অদৃষ্টের দোষে এবার বিপরীত ফল ফল্‌লো। যখন এই গ্রামের পাশ দিয়ে আমার গাড়ী যাচ্ছিল, সেই সময় কোথা থেকে অতর্কিতে তিন চার জন মুসলমান আমাদের গাড়ীর উপর চড়াও হয়। গুণ্ডাদের আসার সঙ্গে সঙ্গেই গাড়োয়ান ও সেই মেয়েটী, যারা আমার পাহারাদার হ'য়ে সঙ্গে আসছিল, তারাই সব আগে সরে পড়ে। তারপর তারা আমার শ্বশুরবাড়ীর

গ্রামে গিয়ে রটিয়ে দেয় যে, পথের মাঝখানে মুসলমানেরা জোর করে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করেছে।

—"গুণ্ডারা যে কি উদ্দেশ্যে আমাকে পথের মাঝে আটকে ছিল তা জানি না! তবে আমার কাকুতি মিনতি আর চোখের জল দেখে বোধ হয় তাদের মনে দয়া হয়েছিল। হাজার হোক, মানুষের চামড়া তো তাদের গায়ে ছিল! তার উপর আমার মুখ থেকে যখন তারা শুনলে যে, বাড়ীতে আমায় কচি কাঁচা ছেলে-মেয়ে আছে, আমার স্বামী আছেন, শ্বাশুড়ী আজো বেঁচে, তখন আর তারা বেশীক্ষন আমাকে ধরে রাখলে না। সবাই মিলে একবার কি যুক্তি করে আমায় ছেড়ে দিলে। ছেড়ে দিবার সময় আমাকে তারা ব'ললে, কি জানো ভাই! যদি কোনও কারণে, তারা তোমাকে ঘরে না নেয়, তা হ'লে তুমি আবার এখানে ফিরে এস, ভয় নেই—আমরাই তোমাকে আশ্রয় দেব। আমি পায়ে হেঁটে পুনরায় শ্বশুরবাড়ী গেলাম। দেখলাম আমি যাবার অনেক আগে থেকেই গ্রামে ঢি ঢি পড়ে গেছে। আমাকে দেখে শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ রণচণ্ডী মূর্ত্তিতে ঝাঁটা হাতে তেড়ে এলেন। ......শ্বশুরবাড়ীতে আমি আর ঢুকতে পেলাম না। স্বামীর সঙ্গে দেখা হ'তে, তাঁর পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লাম, আমি যে কত নির্দ্দোষ, অসহায়া নারী পেয়ে গুণ্ডারা আমার গাড়ী আটক ক'রেছিল মাত্র, কলঙ্ক আমার গায়ে লাগেনি—তারা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—এত কথা বারবার করে তাঁকে জানালাম, তবু তাঁর দয়া হ'লো না। সমাজের কঠিন শাসনে তাঁর হৃদয়ও তখন পাষাণে পরিণত হয়েছিল। তিনি বল্লেন, সবই বুঝি। কিন্তু এখন আর কোনও উপায় নেই। আমি কি করব? এতেই তো

আমাকে দশ জনের কাছে মাথা হেঁট করে চলতে হবে। প্রায়শ্চিত্ত ক'রে তবে জাতে উঠতে হবে। এর উপর সমাজ না মেনে জোর করে তোমাকে ঘরে নিলে আমাকেও সমাজচ্যুত হয়ে থাকতে হবে যে!

—"আমি অনেক মিনতি ক'রে কেঁদে বল্লাম, "আমার কি দোষ? আমি তো কোনও দোষে দোষী নই। তবে আমাকে কেন আমার সাজানো সংসার থেকে এমনি পাষাণের মত, অতিশয় নিষ্ঠুরের মত তুমি তাড়িয়ে দেবে? সোণার ঘরকন্না, আদরের পুত্র কন্যা ত্যাগ করে আমি আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো? কে আমায় রক্ষা করবে? তুমি যদি পায়ে ঠাঁই না দাও—আমার আর আশ্রয় কোথা? যদি ঘরে না ঠাঁই দাও, আমাকে না হয় বাড়ীর কাছে ওই আম-বাগানের মধ্যে একটা কুঁড়ে ক'রে দাও, আমি সেইখানেই থাকবো। তোমাদের বাড়ীর ত্রিসীমানায় আর আসবো না। ওখানে, ওই বাগানের মধ্যে গাছতলা আশ্রয় করে পড়ে থাকলে আর কিছু না পাই, আমার বত্রিশ নাড়ী ছেঁড়া সোণার মাণিক ছেলে-মেয়েকে তো দিনান্তে একটিবারও চোখের দেখা দেখতে পাবো!······ওগো, তুমি এত কঠিন হ'য়ো না। ভুলে যেও না,—আমি যে তাদের মা! তোমার বাড়ীতে তো মুসলমান কৃষাণ রয়েছে, সেও তো অনেক কাজ করে, তোমারই বাড়ীতে ভাত খায়। কই তার জন্যে তোমাদের তো জাত যায় না! মুসলমান গোয়ালার কাছে তোমরা দুধ নাও, কত মুসলমান কাজে-অকাজে বাড়ীতে আসে যায়, তাতে ত জাত যায় না! তবে আমি বাড়ীর বাইরে বাগানে থাকলেও তোমার জাত যাবে কেন? তোমার কুকুরকেও তো ভাত দাও, আমাকে না হয় সেই কুকুরের মতই তোমাদের পাতের উচ্ছিষ্ট এক মুঠো

ভাত ফেলে দিয়ো। তাও যদি না দাও, আমি না হয় নিজের হাতে রেঁধে খাব। কিন্তু হায়রে মন্দভাগ্য! চোখের জলে সপ্তসিন্ধু উথলে উঠলেও, স্বামীর আমার নয়ন গল্‌লো না! সমাজের ভয়ে তাঁর কঠিন ভীরু মন কিছুতেই নরম হল না। তিনি আমার কোন সাহায্য করতেই রাজী হ'তে পারলেন না। আমি তখন নিতান্ত নিরুপায়, আমার শ্বশুর বাড়ী থেকে কোন প্রকারে, পায়ে হেঁটে আমার পিত্রালয়ে এসে উপস্থিত হ'লাম! মা আমাকে দেখে কাঁদতে লাগলেন,। কিন্তু বাবা দেখেই রুদ্রমূর্ত্তি ধরলেন এবং বল্লেন হতভাগী কুল-কলঙ্কিনী তোর মত মেয়ের জন্যে আজ আমাকে দশের কাছে মাথা হেঁট করে চলতে হবে। কোন্ লজ্জায় আবার এখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করলি! বেরিয়ে যা,—পাঁচজনের সামনে আর আমার উঁচুমাথা অমন করে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিসনে!

জিজ্ঞাসা করলাম—'কোথায় আমি যাবো বাবা? স্বামী পায়ে ঠেলেছেন, পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত জন্মের মত ছেড়ে আসতে বাধ্য হ'য়েছি! —তুমিও যদি এমনি করে শিয়াল কুকুরের মত তাড়িয়ে দাও, আমাকে এ-তিন ভুবনে আর কে আশ্রয় দেবে! তুমি যে আমার বাবা!—আমি যে একদিন তোমারই কোলে মানুষ হ'য়ে ছিলাম বাবা!

বাবা তেমনি রুদ্রমূর্ত্তি ধরেই জবাব দিলেন তোর যেখানে খুসি,—চলে যা। যা তোর মন চায় তাই করগে! এখানে আর একদণ্ডও থাকিসনি। থাকলে আমার সর্ব্বনাশ হবে।'

—"আমার তখন ভয়ানক রাগ হ'ল। বিনা দোষে আমাকে এই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে! আমি উপায়হীনা হয়ে পা-পা করে আবার এই এদের কাছেই ফিরে এলাম! নিজের স্বামী, নিজের মা

বাপ, যখন আশ্রয় দিলেন না, তখন কার কাছে আশ্রয় চাইতে যাবো? কোন্ লজ্জায় অপরের কাছে গিয়ে দাঁড়াবো? যে স্বামী একদিন নারায়ণ ও অগ্নিসাক্ষী ক'রে বিবাহ করেছিলেন,—আপদে বিপদে আমায় রক্ষা করবেন ও ভরণ-পোষণের জন্য তিনি ধর্ম্মত দায়ী থাকবেন বলে ছিলেন,—তিনিই যখন নিজের কর্ত্তব্য করলেন না, তখন আমার আবার দায়িত্ব কোথায়?

প্রথমে এখানে এই সম্পূর্ণ আলাদা সমাজের মধ্যে এসে আমার কষ্ট হ'ত, তারপর আস্তে আস্তে দিব্যি—সয়ে গেল। এখন আমি যার কাছে আছি এ-লোকটি আমাকে কোনোদিন অযত্ন করেনি। মুসলমান ধর্ম্ম নিয়ে, আমি অগত্যা তাকেই নিকে করেছি। আবার আমার ছেলেও হয়েছে।'

—"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'আপনার আগের ছেলে মেয়ে বা স্বামীর জন্যে মন কেমন করে না?' —'করলেও তো উপায় নেই ভাই। তারা আমায় চায় নি, যখন আমি তাদের পায়ে ধরে কেঁদেছিলাম। মন আর দেহ মানুষের দুটোই হ'লো মহাশয়! যা সহ্য করাবে তাই সে ঘাড় পেতে সয়। দায়ে প'ড়ে আমারও সব স'য়ে গেছে।"

১১

—"তা হ'লে আমাকে কি এরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর ক'রে মুসলমানী সাজিয়ে নিকে করবে? দোহাই আপনার আমাকে উদ্ধার করুন।"

এই বলিয়া আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ফতিমা বিবির পা জড়াইয়া ধরিলাম।

তিনি আমাকে সযত্নে ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, "তোমাকে দেখে আমারও কেমন ধারা মায়া পড়ে গেছে ভাই। তোমার যাতে উপকার হয় তারই চেষ্টা আমি করব। এখন হাত মুখ ধুয়ে কিছু চিড়ে মুড়কি খাও। কিছু না খেলে প্রাণ বাঁচবে কেন? তাছাড়া পালাবার সময়েও তো গায়ে জোর থাকা চাই! নতুবা হাঁটতে পারবে কেন? আমার এই মুসলমান স্বামীটি ভাগ্যিস তোমায় এ বাড়ীতে রাখবার ব্যবস্থা ক'রেছেন, নইলে তোমার সঙ্গে তো আমার দেখাই হ'তো না। রাম গঙ্গা—আমিও এর কিছুই জানতে পারতাম না! আমার ভাগ্যে যা থাকে থাক,—আমি যেমন ক'রে পারি তোমায় বাঁচাবো। এখন বেশী গোলমাল করো না। ভাবে ভঙ্গীতে দেখাও যে, তুমি সত্যিকার নিরুপায়, কাজেই এদের প্রস্তাবে রাজী না হলে তোমার বেঁচে থাকার কোন পথ নেই। আমিও সকলের কাছে তোমার সম্বন্ধে এমনি কথাই বলব। তারপর সুযোগ পেলেই আমি তোমাকে পালাবার পথ করে দেব। তাতে বাঁচি আর মরি!...ভেব না তুমি একটুও।"

আমি তাড়াতাড়ি তার পায়ের ধূলা লইয়া বলিলাম, "দিদি আপনি আর জন্মে নিশ্চয়ই আমার মা'র পেটের বোন্ ছিলেন।"

আমি তাঁহার কথামত ইচ্ছা না থাকিলেও অগত্যা কিছু গুড় দিয়া চিড়ে খাইয়া, কুয়া হইতে জল তুলিয়া পান করিলাম। তিনি সত্য কথাই বলিয়াছিলেন, না খাইয়া শরীর অবসন্ন হইলে, কি করিয়া পলাইব? মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, নিজের ধর্ম্ম ও সতীত্ব-রত্ন ইহাদের পায়ে সহজে ডালি দিতেছি না। প্রাণ যায় সে ও স্বীকার! জীবন তো এ জগতের; কিন্তু আমার পবিত্র ধর্ম্ম পরজগতে ও আমার সঙ্গে যাইবে! ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়া...সে তো নিতান্তই তুচ্ছ কথা।

কিছুক্ষণ পরে ফতিমা প্রস্থান করিলে, আর একটি মেয়ে আসিয়া আমার সঙ্গে আলাপ করিল। কথায় বুঝিলাম, একদা সেও হিন্দু-ঘরের বাল-বিধবা ছিল। যে কারণেই হউক, এখন সে, মুসলমানের ঘরের বধূ হইয়া, বেশ আনন্দেই আছে। শিক্ষা মত তাহার নিকটে এমন ভাব প্রকাশ করিলাম, যাহাতে সে অনায়াসে বুঝিয়া লইল যে আমিও তাহাদেরই মত মুসলমান-সমাজভুক্ত হইয়া এবং মুসলমানের বধূ হইয়াঅবশিষ্ট জীবন কাটাইতে রাজী আছি।

মেয়েটি বোধহয় পুরুষ মহলে গিয়া এই সব কথা বলিয়াছিল। কেননা, বেশ বুঝিতে পারিলাম আমার উপর আর বিশেষ কড়াকড়ি ভাব রহিল না। যাহারা আমাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অনেককেই দেখিতে পাইতাম। তাহারাও আমাকে নানা প্রলোভন দেখাইয়া নানা ভাবে বুঝাইত। হিন্দু-ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক নিন্দাও করিত, এবং কথায় কথায় ইহাও জানাইতে কসুর করিত না যে, আমার অদৃষ্ট খুবই ভাল, তাই জমিদার পুত্রের নজরে পড়িয়াছি।

দুই দিন দুই রাত্রি নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবার পর, আমার পলাইবার সুবিধা হইল।

আমি সর্ব্বদাই তালাবদ্ধ থাকিতাম। বিশেষ কোনো প্রয়োজনের সময় ডাকিলে তালা খুলিয়া দিত বটে; কিন্তু নজর রাখিত কড়া! যাহাতে আমি পালাইতে না পারি! আমি যে ঘরে আবদ্ধ থাকিতাম, তাহার পিছন দিকে নামমাত্র একটি জানালা ছিল। সে জানালা দিয়া আলো বাতাস প্রবেশ করিত কি না, যিনি সেই ঘরের মালিক তিনিই বলিতে পারেন, তবে আমার যে দিবারাত্রি দম বন্ধ হওয়ার অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল একথা বলাই বাহুল্য। বাটীর মালিকের পত্নী আমাকে স্নেহ বশে মতলব দিলেন যে, এই জানালার মধ্য দিয়া গলিয়া কেহ বাহিরে যাইতে পারে, সে বিষয়ে গৃহকর্ত্তারা কদাপি চিন্তা করেন নাই। সুতরাং এইটিই তোমার পরিত্রাণের উপযুক্ত পথ!

যে জমিদার পুত্রের জন্য, আমাকে এরা হরণ করিয়া আনিয়াছে, অদ্য সেখানে সকলের নিমন্ত্রণ। আসিতে বোধহয় অনেক রাত্রিই হইবে। এই কথা আমার দয়াময়ী উদ্ধারকর্ত্রী আসিয়া জানাইলেন এবং বলিলেন, —"আজ তোমার পালাবার খুব সুযোগ। কেউ বাড়ী নেই সব গেছে জমিদারের বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে। তুমি খানিকটা দড়ি বেয়ে জানালা দিয়ে ঘরের বার দিকে ঝুলে পড়ো। দড়ি আমি তোমায় যোগাড় ক'রে দিচ্ছি। বাহির থেকে তালা বন্ধ থাকলেও তোমার কোন অসুবিধা হবে না। এদিকে আমাকেও কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

সকালে এসে যখন তারা ঘরের তালা খুলবে, তখন জানতে পারবে যে তুমি কি করে পালিয়েছ! নেশা ভাঙ্গ ক'রে আমোদ হবে সেখানে।

সুতরাং ফিরতে তাদের আজ অনেক রাত্রি। ততক্ষণে তুমি অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। ঠিক সময় বুঝে আমি তোমায় সঙ্কেত্ করব। তুমি নিঃসন্দেহে দড়ি বেয়ে ঝুলে প'ড়ো। তারপর তোমাকে আমি সঙ্গে ক'রে নদীর ধারে দিয়ে নিয়ে গিয়ে, সোজাপথ দেখিয়ে দেব, যাতে তুমি সহজেই অন্য গ্রামে গিয়ে পৌছুতে পার।" এই বলিয়া সেই করুণাময়ী নারী কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

আমি মনে মনে তাঁহাকে বার বার সভক্তি নমস্কার জানাইলাম।

১২

ফতিমাবিবি এক গাছা খড়ের দড়ি দিয়াছিলেন এবং ইহাও আমাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, "ঘরের কোণে আঁটিকতক খড় জমা করা রয়েছে, তাই থেকে তুমি এক আঁটী নিয়ে মাথায় দিয়ে শোও। তাহলে ওরা ফিরের এসে ভাববে তুমি ঐ খড় থেকেই নিজের হাতেই দড়ি বানিয়ে নিয়েছ। তাতে ক'রে আমাকে আর কেউ সন্দেহ করতে পারবে না।

সন্ধ্যার একটু পরে, অমার হিতৈষিণী ফতিমাবিবি অর্থাৎ বাটীর মালিকের স্ত্রী আসিয়া আস্তে আস্তে দরজায় ঘা দিয়া বলিলেন, "তুমি ভগবানের নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ো। এই হচ্ছে তোমার পালাবার সুবর্ণ সুযোগ। আমি কাছেই অপেক্ষা করব, এবং তোমাকে নদীর পথটা দেখিয়ে দিয়ে ফিরে চলে আসবো।"

আমি তৎক্ষনাৎ শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া, দড়িটা ঘরের মাচার সঙ্গে বাঁধিয়া, জানালার ভিতর দিয়া, বাহিরে ফেলিয়া দিলাম। পূর্ব্বের শিক্ষামত, ঘরের ভিতর মাটীর যে একটা জালা ছিল, সেইটাই জানালার কাছে টানিয়া আনিয়া এবং তাহারই উপর উঠিয়া, জানালা গলিয়া দড়ির সাহায্যে বাহিরে ঝুলিয়া পড়িলাম। বাহির দিক হইতে জানালাটি বেশী উঁচু ছিল না, এবং আমার পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পুণ্যফলে জানালায় কপাটও ছিল না, একদম বাজে পুরাতন ঘুণ-লাগা বাঁশের বাকারীর তৈয়ারী, কাজেই দুর্ব্বল স্ত্রীলোক হইয়াও তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আমাকে বেগ পাইতে হয় নাই।

মাটিতে পা পড়িতেই আনন্দে গা কাঁপিয়া উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দেখি, আমার উদ্ধারকর্ত্রী, একটি কলসী লইযা জল আনিবার ছলে নিকটেই দাঁড়াইয়া আছেন।

আমরা দুই জনে দ্রুত চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরেই নদী পাইলাম। তিনি আমার গন্তব্য স্থানের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "এখান থেকে নদীর ধারে ধারে সামনের রাস্তা দিয়ে গেলে, ক্রোশ দুই পরে, বড় রকমের একখানা জেলেদের গ্রাম পাবে। তারা তোমার দুঃখের কথা শুনলে নিশ্চয়ই আশ্রয় দেবে। জাতে তারা ছোট হ'লেও অন্তরে রাজার চেয়ে একচুলও নীচে নয়। এর প্রমাণ আমিও একদিন হাতে হাতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সে সব কথা বলবার আর সময় নেই এখন তুমি আর দেরী করো না ভাই।"

আমি পুনরায় তাঁহার পায়ের ধূলি লইয়া বলিলাম, "চিরদিন আপনার কথা মনে থাকবে, দিদি।"

তাহার পর আর কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়া, শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়া, যথাসাধ্য দ্রুত চলিতে লাগিলাম ; আর মনে হইতে লাগিল তাহারা বুঝি জানিতে পারিয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে !

কিছুক্ষণ পরে মধুসূদন মুখ তুলিয়া চাহিলেন। আকাশে সামান্য জ্যোৎস্না দেখা দিল। সেই অস্পষ্ট চন্দ্রালোকে ঘণ্টা খানেক পথ চলিবার পর, দূরে ক্ষীণ-আলো দেখিতে পাইয়া অনুমানে বুঝিতে পারিলাম, আমি জেলেদের গ্রামের নিকটে আসিয়া পৌছিয়াছি। আমি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হইয়া আরো দ্রুত পথ চলিতে লাগিলাম। অত রাত্রেও কতকগুলি জেলে জলের ধারে বসিয়া জাল মেরামত করিতেছিল।

আমি তাহাদের নিকটে যাইয়া আছাড় খাইয়া পড়িবা মাত্র আমার জ্ঞান লোপ পাইয়া গেল।

সংজ্ঞা ফিরিলে দেখিলাম, তাহারা আমাকে একটা দরমার উপর শোয়াইয়া, মুখে চোখে জল দিতেছে।

আমাকে তাকাইতে দেখিয়া, তাহারা চারিদিক হইতে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি কোন প্রকারে মুসলমান কর্ত্তৃক আমার লাঞ্ছিত ইতিহাস তাহাদিগকে বলিলাম। তাহারা আমার দুঃখের ইতিহাস শ্রবণ করিয়া প্রথমে ভয়ানক রাগিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের নিজেদের মধ্যে নানারূপ আলোচনা চলিতে লাগিল।

আমি সামান্য একটুখানি শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম, তাহাদের

আলোচনার বস্তু আমি. এবং আমাকে যাহারা স্নেহনীড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নরকের গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়াছে তাহারা। ভাবে বুঝিলাম ওই সমস্ত গুণ্ডাদের উপর তাহারা হাড়ে চটা। কিন্তু তাহারা দরিদ্র, তদুপরি নিরতিশয় দুর্ব্বল। কাজেই গোপনে ঘরে বসিয়া তীব্র আলোচনা করা ভিন্ন আর তাহাদের বিশেষ কোনো ক্ষমতা নাই!

দীর্ঘকাল আলোচনার পর তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ এক বৃদ্ধ ধীবর আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "মা, আমরা নেহাৎ ছোট জাত, তার উপর গরীব। সব দিন আমাদের পেটে অন্ন পড়ে না। নিজেদের পেটের জ্বালায় দিন রাত আমাদের জলে জলে মাছ ধরে বেড়াতে হয়। তোমার এহেন বিপদের দিনে আমরা আর বিশেষ কি করবো, তবে তোমার যতদিন খুসী আমাদের এখানে থাকতে পারো। লুকিয়ে থাকতে চাও, তারও ব্যবস্থা আমরা করে দেব। মোট কথা, আমাদের শক্তিতে যা কুলিয়ে উঠবে, তোমার জন্যে আমরা তা করবো মা, তোমার খাওয়া থাকা, সম্বন্ধে কোনো অসুবিধা হবে না এ খানে। আর যদি তুমি তোমার নিজের লোকদের কাছে আবার ফিরে যেতে চাও, অথবা তাদের কাছে খবর পাঠাতে বলো, আমরা তারও ব্যবস্থা করতে পারবো। তবে সেখানে যাওয়া না যাওয়া তোমার কাছে সমান কথা। খুব সম্ভব তারা তোমাকে আর ঘরে নেবে না মা।

তাহাদের কথা শুনিয়া মনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শান্তি পাইলাম। মনে মনে ভাবিলাম, এরা সব বলে কি? আমাকে আমার আত্মীয়-স্বজনে বাড়ীতে লইবে না কেন? কি আমার দোষ? আমি ত স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে বাইরে আসিনি। আমার অজ্ঞাতসারে, ইচ্ছার একান্ত বিরুদ্ধে,

জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র অহল্যার অজ্ঞাতসারে তাঁর সতীত্ব হরণ করিলেও, আজও পর্য্যন্ত তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া সতী শিরোমণি হইয়া জগতে পূজা পাইতেছেন। প্রাতঃকালে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিয়া শয্যা ত্যাগ করিলে নাকি মহাপাপেরও বিনাশ হয়। আর আমি? কোনও দোষে দোষী নই। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করিয়া আমাকে ঘর হইতে ধরিয়া আনিয়াছে, ইহাতেই আমাকে সমাজ-চ্যুত তথা—আত্মীয় পরিজন হইতে পৃথক হইয়া দূরে দূর হইয়া থাকিতে হইবে! দাদা আমাকে কেন ঘরে নেবেন না? মুসলমান আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছে বলিয়াই কি আমার জাত গিয়াছে! এই ত সেদিন মুসলমান গাড়োয়ান আমাকে গাড়ীতে চাপাইয়া লইয়া আসিয়াছিল। হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে নামাইয়াছিল; কই তখন ত জাত যায় নাই। যদি আমি মুসলমানী হইতাম; তাহাতেই বা কি? আমাদের বাড়ীতে মুসলমান কৃষাণ আছে। কতদিন দাদার বাসায় মুসলমান গোয়ালার নিকট দুধ খাইয়া ছ। তাহাতে জাত গেলনা—বিন্দুমাত্র অপরাধ হইলনা,—আর আজ....আজ আমার আর কুত্রাপি স্থান নাই! আজ আমি সমাজ-পরিত্যক্তা—আত্মীয় বান্ধবহারা—পথের ভিখারিনী কাঙ্গালিনী!

কিন্তু হায়! তখন তো বুঝি নাই আমাদের হিন্দুর সনাতন সমাজের কতবড় কঠিন শাস্তি! দৈব দুর্ব্বিপাকে নিতান্ত নির্দ্দোষ হইয়াও অদৃষ্ট-তাড়নায় একবার যখন ঘর হইতে পথে পা দিতে বাধ্য হইয়াছি, তখন আমার চরিত্র খারাপ না হইলেও, চরিত্রহীনার মধ্যেই গণ্য হইয়া আমাকে অবশ্যই সমাজের বাহিরে থাকিতে হইবে! জীবনে কখনও আর আত্মীয়দের সংস্পর্শে আসিতে পারিব না! একটা চরিত্রহীনা

দাসীকে বাড়ীতে রাখিলে দোষ হয় না; আর যত দোষ নিজের আত্মীয়াকে আশ্রয় দিলেই! সমাজের একি বিচার? যদি কেহ দোষ করে, তাহাকে অন্ততঃ একবারও শোধরাবার জন্য সময় দেওয়া উচিত, কিন্তু এ যে বিনা দোষে অমোঘ দণ্ড!

হায়! সমাজের কাপুরুষ পুরুষগণ! তোমরা নিজেদের আশ্রিত স্ত্রী-কন্যা ভগ্নীদের রক্ষা করিতে জাননা, অথচ তাহারা যদি কখনও নিজের ক্ষমতায় সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া তোমাদের নিকট ফিরিয়া আসিতে চায়, তখন তোমরা দুশো জনে দু'হাজার রকমের ব্যবস্থা প্রদানের জন্য গর্দ্দভের ন্যায় চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া চীৎকারে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিতে পারো। তামাকের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে করিতে, সমাজ-নেতা সাজিয়া সমাজেরই মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দিতে জানো! তোমরা নিজেরা, হাতের একটা আঙ্গুল কাটিলে যাতনায় ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে জানো, কিন্তু জীবন্মৃতকে সাহস করিয়া বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে শেখ না! তোমরা লক্ষ সতীর সতীত্ব নাশে পরাঙ্মুখ নও, অথচ দৈবাৎ অজ্ঞাতসারে কাহারও চরিত্রে এতটুকু রেখাপাত হইলে, তাহার জন্য কামান দাগিতে তোমরা সত্যিকার বাহাদুর! নিরাশ্রয়া অবলা জাতির উপর এত অত্যাচার তোমাদের কেন? তোমাদের নিজেদের ব্যভিচারের ত কোন শাস্তি হয় না। বরং তোমরাই সমাজের মধ্যে বুক ফুলাইয়া হাসিয়া-খেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াও! কিন্তু মনে জেনো, এ অত্যাচার আর বেশী দিন করিতে হইবে না। অবলা নারীর করুণ ক্রন্দনে একদিন আদ্যাশক্তির আসন নিশ্চয়ই টলিবে। তখন নারীজাতি নিজেদের অধিকার কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়া লইবেই। ইহা খাঁটি সত্য কথা!

১৩

হিতৈষী ধীবরদিগের পরামর্শ মত, আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া মাকে ও দাদাকে পত্র লিখিলাম। মা'র নিকট হইতে কোনও জবাব আসিল না। তবে শিক্ষিত ও বর্ত্তমান সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমার দাদা মহাশয় সংক্ষেপে পত্রের উত্তর দিয়া জানাইয়াছেন যে, তিনি আর আমাকে ঘরে লইতে পারেন না! লইলে তাঁহাকে সমাজচ্যুত হইয়া থাকিতে হইবে। মাতাঠাকুরাণীও আমার পত্র পাইয়াছেন; কিন্তু ঐ সমাজের ভয়েই তিনি পত্রের উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি প্রকাশ্যে কোনই সাহায্য করিতে পারিবেন না, তবে সময়ে সময়ে লুকাইয়া লুকাইয়া কিছু টাকা-কড়ি পাঠাইয়া সাহায্য করিতে পারেন! আমি যেন ভুলিয়াও কখনোও তাঁহাদের নিকট কোন পত্র না লিখি!

আমি এত বিপদের মধ্যে এত লোকের এত কথা শুনিয়াও ভাবিতে পারি নাই, আমার উচ্চশিক্ষিত দাদা আমাকে এইরূপ ভাবে পত্র দিতে পারিবেন! মনে মনে বলিলাম, "তুমি আমার মা'র পেটের বড় ভাই! বাবা মৃত্যুর সময় তোমারই হাতে আমার রক্ষণাবেক্ষণের সকল ভার সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। তুমি উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, তুমি যদি কঙ্কাল-সর্ব্বস্ব দুর্ব্বল অপদার্থ এই সমাজের দৃষ্টিশক্তি হীন চোখের চোখ-রাঙ্গানীর ভয়ে, অবহেলে তোমার সহোদরা আশ্রিতাকে ত্যাগ করিতে পার, তবে সংসারে আর কে আমাকে আশ্রয় দিবে?

হায়রে বিষহীন বিষধর সমাজ! ধার হীন অস্ত্র মাত্র তুমি,—তোমার লোক—দেখানো গর্জ্জন মাত্র সম্বল এখন! তুমি আজ ছিন্নমস্তার মত স্বহস্তে আপন মস্তক ছিন্ন করিয়া নিজের রক্ত নিজে পান করিতেছ! অথচ তোমার উদ্দেশ্য নাই, তোমার ভাব নাই, ভালবাসা নাই, তোমার কিছু নাই! মুকুটহীন রাজা সাজিয়া, ভূমিহীন ভূম্যধিকারী হইয়া সমাজের উপর তুমি যে অত্যাচার সুরু করিয়াছ, একদিন ইহারই ফলে তোমার সর্ব্বনাশ হইবেই—হইবে!

তোমার অত্যাচার অবিচারে, তোমার সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে কত অসহায়া নারী তার মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া জলে-জঙ্গলে গহনে-পর্ব্বতে নিরুপায় হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে,—কত নারী উপবাসে মৃত্যু কামনা করিতেছে, তুমি তার কতটুকু জানো?

আজ শুধু আমি একা নই, এইরূপ আমার ন্যায় কত শত হতভাগিনী, সমাজের অত্যাচারে প্রপীড়িতা হইয়া, বিষ উদ্গীরণ করিয়া, সমাজকে এইরূপ নির্ম্মমভাবে দংশন করিতেছে যে, তাহাতে সমাজের দুর্ব্বল মেরুদণ্ড বিষে পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে! এখনও সময় আছে, হয়তো চেষ্টা করিলে ইহার প্রতিকার করিতে পারা যাইবে, নতুবা এমন একদিন আসিবে, যে দিন এই হতভাগিনীদের বিষে, অন্ধ সমাজ বিষ জর্জ্জরিত হইয়া সমূলে ধ্বংসের পথে নামিয়া পড়িবে! তখন ইহার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত থাকিবে না!

দাদার পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া আমার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ জেলে আমার দিকে তাকাইয়া, একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তোমাকে

যে বাড়ীতে আর নেবে না, সে কথা ত আমি আগেই বলেছিলাম মা! আমরা ছোটলোক, বলা আমাদের উচিত না, তবু আমরা এ সব বিষয়ে যেটুকু সাহস দেখাতে পারি, তোমাদের ভদ্রলোকদের মধ্যে সে সাহসটুকু দেখাবার ক্ষমতা একজনেরও নাই। আমরা ত ছোটলোক, আমরা সর্ব্বদাই ভদ্রলোকদের অনুকরণ করে থাকি। জানি তাঁরা বিদ্বান, যা ভাল তাই করেন। তথাপি মা, আমরা মূর্খ—ছোটলোক জেলে হলেও, নিজেদের স্ত্রী, বোন্ বা মেয়েকে কখনই বিনাদোষে ছাড়তে পারি না। এইজন্যেই হয়তো তোমাদের ভদ্রলোকেরা বলেন, আমরা মূর্খ! কিন্তু মূর্খ হলেও, আমাদের বাড়ীর মেয়েদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যে আমরা যথেষ্ট স্বাধীনতা দিই। আর শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সেটুকু সুবিধা ত দেনই না, বরং বাড়ীর মধ্যে দিনরাত তাঁদের বন্ধ ক'রে রেখে, এমন এক একটি জীব তৈরী করেন যে, তাঁরা কোন গতিকে বাড়ীর বার হলে আর নিজেকে সাম্‌লাতে পারেন না!

দেখ মা, ছোটলোকদের মধ্যে যদি কোন মে'য়ছেলে, দৈবাৎ একটা ভুল করে, তা হ'লে তাকে অতল জলে ফেলে না দিয়ে শোধরাবার সুযোগ দেওয়া হয়। সমাজের মধ্যে বেশী বাড়াবাড়ি করলে দশজনে ব'সে, সামাজিক বিচারে, কিছু জরিমানা বা অন্য কিছু করে তাকে সমাজের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু তোমাদের ভদ্রলোকেরা, দোষ না থাকলেও, ঘরে আনবার সুবিধা দেওয়াত দূরের কথা, বাড়ীর ছাঁচ-তলায় বা কানাচেও আসতে দেয় না!

"দেখ মা, তোমাদের কত ভদ্রলোককে দেখেছি, কত নীচ জাতের মেয়েদের মধ্যে এসে, যা খুসী তাই তারা করে, অখাদ্য কুখাদ্য কত খায়,

কিন্তু কই তাতে তো তারা সমাজে পতিত হয় না? কিন্তু তাদেরই বাড়ীর মেয়েদের দোষ না থাকলেও, ওই সব ভদ্রলোকদের বিধানেই তাদের আর ঘরে ঠাঁই হবে না! তোমার ভাই একটী বেশ্যা স্ত্রীলোককে ঝি-হিসেবে বাড়ীতে অনায়াসে জায়গা দিতে পারেন, কিন্তু তোমাকে বাড়ীর বাইরে রেখে, এক মুঠো অন্ন দিলেই তাঁর সাতপুরুষ নরকে ত যাবেই উপরন্তু তিনি দশের কাছে ঠেলা হ'য়ে একঘরে থাকবেন।"

—"দেখ মা! আমরা নীচ, নমঃশূদ্র! তোমাদের বামুন-কায়েতরা আমাদের ছায়া মাড়ায় না—ছোঁয়া ছুঁয়ি হ'লে চান করে। আমাদের ছেলেরা তাঁদের ছেলেদের সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়তে পায় না, এমন কি তাদের নাপিতে আমাদেরকে কামায় না। কিন্তু আমরা যদি আজ নিজের হিন্দুধর্ম্ম ছেড়ে দিয়ে খৃষ্টান হই, তা হ'লে আমাকে ছুঁলে আড়াই হাত লম্বা টিকিধারী বামুনেরও আর জাত যাবে না। একটা ধোপদোস্ত জামা গায়ে দিয়ে সেইসব বামুন-কায়েতদের বাড়ী গেলে, তারাই আমাদের ভদ্রলোক বলে আদর করে বসতে আসন দেবে। মুখ তুলে হেসে কথা কইবে। আমাদের ছেলেরা অনায়াসে তাদের ছেলেদের সঙ্গে এক পাঠশালায় পড়তে পাবে। নাপিতরাও ভদ্রলোক বলে এই সব চণ্ডালদের চুল-দাড়ী কামাবে।"

—"সমাজের এত অত্যাচার, এত লাথি-ঝাঁটা খেয়েও আমরা মুখ বুজে পড়ে আছি। কিন্তু দেখ মা, এই ধর্ম্মের জন্যে কোন দিন লাঠি বা মাথার দরকার হলে, তখন এই ছোট জাতেরাই লাঠি হাতে ছুটে যাবে, এরাই মাথা পেতে রক্ত দেবে। যে সব বড় জাতের মুরব্বিরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে গরীবদের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করেন, সে সব

সময় তাঁদের টিকিও দেখতে পাওয়া যাবে না। তাইতো সময় সময় ভাবি মা, এত অত্যাচার বসুমতী কি করে সহ্য করবেন!

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ ধীবর দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিল। আমি দেখিলাম, তাহার ক্লিষ্ট মুখে এবং সজল চোখের দৃষ্টির মধ্যে তীব্র তেজস্বীতা ও দৃঢ়তা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধরাগলায় চোখ মুছিতে মুছিতে আমি কহিলাম—"তবে কি আমি মুসলমানদের ঘরেই ফিরে যাব আবার?"

আমার কথা শুনিয়া আশ্রয়দাতা ধীবর চমকিয়া উঠিয়া বলি, "সে কি মা, তাও কি কখনও হ'তে পারে। তুমি হিঁদুর ঘরের মেয়ে, তুমি কেনা মুসলমানী হ'তে যাবে? সমাজ ভুল করে তোমাকে ত্যাগ করতে পারে, তাই বলে তুমি কেন ধর্ম্ম ত্যাগ করবে মা? ধর্ম্মের জন্যে লোকে প্রাণ দেয়, তুমি না হয় সমাজই ত্যাগ করলে! যদি তোমার মত সবাই এমনি ভাবে সমাজের অত্যাচার পেয়ে নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে পরধর্ম্মের আশ্রয় নেয়, তবে হিন্দুধর্ম্ম—টিকবে কেন মা?"

—"এমনি করেই আমাদের হিন্দু সমাজ দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে আর খৃষ্টান ও মুসলমান সমাজ পুষ্ট হচ্ছে। একজন হিন্দু পুরুষ, মুসলমান বা খৃষ্টান হলে হিন্দুধর্ম্মের যত না ক্ষতি হয়; একজন যুবতী হলে তার চেয়ে ঢের বেশী ক্ষতি হয়। তার কারণ এক যুবতী স্ত্রীলোক হলে, তার সন্তান-সন্ততি হয়ে গোষ্ঠী বৃদ্ধি করে দেয়। আমার মনে হয় কতকগুলি গুণ্ডা-প্রকৃতির বিধর্ম্মীরা কেবল শুধু কামের তাড়নাতেই হিন্দুনারী হরণ করে না। অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সে উদ্দেশ্য আপন জাতিকে সবল ও পুষ্ট করা—নিজেদের দল বৃদ্ধি করা। কখনও কি দেখেছ মা,

মুসলমান বা খৃষ্টান গুণ্ডারা সাধ করে খৃষ্টান বা মুসলমান যুবতী হরণ করেছে ?—খুব কম, মা। হাজারে হয়তো একটা !"

"তবে এখন আমার উপায় ?"

আশ্রয়দাতা বলিল, "আমরা হীন, গরীব হলেও অনায়াসে তোমাকে রাখতে পারতাম ; কিন্তু যারা তোমাকে হরণ করে এনেছিল, তারা জানতে পারলে পুনরায় অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে। তাদের এত কাছে তোমাকে রাখতে আমাদের সাহসে কুলোয় না, মা। আমরা সব গরীব, খেটে খেতে হয়। সব সময় তো বাড়ীতে থাকি না! সুযোগ বুঝে সেই নরপশুরা যদি আবার অত্যাচার করে, তবে কে তোমাকে বাঁচাবে মা ?

—"আমি ঠিক করেছি, আমার একজন পরিচিত পাটের মহাজন, দাদন দিবার জন্যে এখানে এসেছেন ; তুমি তাঁর সঙ্গে কলকাতা যাও। সেখানে গিয়ে গতর খাটিয়ে খাবে। মনে ভাববে, ত্রিসংসারে তোমার কেউ বেঁচে নেই। আছেন কেবল অগতির গতি ভগবান! যদি কখন দরকার বোধ হয়, তবে এই বুড়ো ছেলেকে জানিও মা। আমি আমার সাধ্য মত সাহায্য তোমার করব।"

মনে মনে ভাবিলাম, তাহার পরামর্শ মত চলা ছাড়া আর আমার অন্য উপায় নাই।

বৃদ্ধ ধীবর সেই মহাজনকে আমার সম্বন্ধে অনেক সুপারিশ করিয়া কোন প্রকারে তাহাকে রাজী করিল।

মহাজন আসিয়া আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "মা তুমি আমার স্বজাতীয়া...কায়স্থ-কন্যা। তোমার এইরূপ বিপদে আমার সাহায্য করা

খুবই উচিত। আমারও একজন লোকের দরকার। বাড়ীতে গিন্নীর শরীর আজকাল তেমন ভাল থাকে না। বড় ছেলেটির সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে বটে, কিন্তু পুত্রবধূ পিত্রালয়ে আছেন। তাঁর আসতে এখনও দেরী আছে। তুমি সুন্দরী, তার উপর—তোমার বড্ড কাঁচা বয়েস, এই সব দেখে শুনে গিন্নী হয়ত তোমার ঘরে রাখতে আপত্তি করতে পারেন। যদি তুমি একটুখানি মিথ্যা কথা বলতে পার মা, তবে একটা ভালো রকম ব্যবস্থাই হতে পারে। তুমি বলবে, যে, সংসারে তোমার কেউ নেই। পল্লীগ্রামের অধিকাংশ লোকই গরীব। কাজ-কর্ম্মের জন্যে লোকজন বড় একটা কেউ রাখে না। আর রাখলেই বা নিজের গ্রামে পরিচিতদের মধ্যে কি করে দাসীবৃত্তি করা যায়; কাজেই কাজের চেষ্টায় তুমি আমার সঙ্গে এসেছ।"

আমি তখন কোনও প্রকারে চক্ষের জল রোধ করিয়া বলিলাম, "সত্যই যদি সংসারে আমার কেউ থাকতো, তা হ'লে ভদ্রঘরের কুলবধূ হয়ে কি আজ আমি একমুঠো ভাতের জন্যে পরের ঘরে দাসীবৃত্তি করতে যেতাম?"

এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে অবাধ্য চক্ষের জল মানা না মানিয়া ঝর ঝর করিয়া কপোল বহিয়া ঝরিতে লাগিল।

বোধ হইল, সেই মহাজন মহাশয় যেন দুঃখিত ও একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছেন!

১৪

ইহার দুই দিন পরে, এক প্রত্যূষে আশ্রয়-দাতা বৃদ্ধ ধীবর আমাকে ও পূর্ব্বোক্ত মহাজনকে নিজের নৌকাতে লইয়া কুষ্টিয়া রেলষ্টেশনের দিকে রওনা হইল।

নৌকায় যাইতে যাইতে লক্ষ্য করিলাম, বর্ষার জলে গৌরী নদীর বক্ষ যেন ভরা যৌবনে টল-টল করিতেছে। প্রতি ঘাটে, পল্লীবধূরা কেহ বাসন মাজিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা স্নান সমাপন করিয়া, কলসী কাকে কুটীরের দিকে রওনা হইতেছে। হায়! আজ আমি, ঠিক তাহাদেরই মত কুলবধূ হইয়া, সর্ব্বস্ব হারাইয়া কোন্ অনিশ্চিত অচেনা দেশে রওনা হইতেছি! আমার এ যাত্রা শুভ হইবে কি অশুভ হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত আছে। এক ভগবান ছাড়া সেকথা আর কে বলিতে পারে?

অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, ভগবান! খুব শাস্তি দিয়েছ। তুমি যদি সত্য সত্যই অন্তর্য্যামী হও, অন্তরের কথা তো তোমার অজ্ঞাত নাই ঠাকুর! আজ তোমার চরণে করজোড়ে প্রার্থনা জানাই,—হে সর্ব্বশক্তিমান দয়াময়! আবার যদি নারী-জন্মই আমাকে নিতে হয়, তাহলে দোহাই প্রভু, এই নিতান্ত অবিচারের জায়গা এই বাংলা দেশে যেন আর আমাকে পাঠিও না। যদি পাঠাও, তবে এই দুর্গন্ধময় পঙ্কিল সমাজকে ভালরূপ সংস্কার ক'রে তারপর পাঠিও।
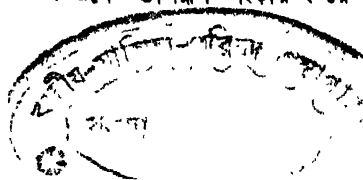
যথা সময়ে কুষ্টিয়া রেল-ষ্টেশনে আসিয়া, কলিকাতাগামী ট্রেণ ধরিলাম। আশ্রয়দাতা বৃদ্ধ ধীবর, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া, ছল ছল নেত্রে আমার নিকট হইতে বিদায় লইল। তাহাকে বিদায় দিতে, আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মনে হইল, সে নীচ জাতি হইলেও, এত বড় জগতের মধ্যে তাহার তুল্য বড়, তাহার মত সুমহান্ বুঝি বাংলার বুকে খুব কমই পাওয়া যায়। সেই তখন আমার একমাত্র আপনার জন। এতদিন যাহাদিগকে আপনার বলিয়া জানিতাম, যাহাদের সহিত আমার রক্তের সম্বন্ধ, যাহাদের স্নেহে ও যত্নে এত বড় হইয়াছি; তাহারা কিনা সমাজের তুচ্ছ অন্যায় শাসনের জন্য চির অপরিচিতার মতই আমাকে পরিত্যাগ করিল? কিন্তু এই দীন ধীবর, সমাজের বহু নিম্নে ইহার স্থান হইলেও, বিনাদ্বিধায় সে আমাকে আশ্রয় দিয়াছে। এমন কি নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও সে আমায় আশ্রয়দিতে অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু কেহই আমার দুঃখে সাড়া দেয় নাই। উপরন্তু ব্যভিচারিণীকে আশ্রয় দিলে, তাহাদের মহাপাপ হইবে, এই কথাই বারংবার জানাইয়া দিয়াছে! কে বড়? সমাজের উপেক্ষিত এই নীচ জাতি না সেই সব ভদ্র বেশধারী সমাজ-সর্ব্বস্ব মহাপ্রভু?

যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। ছাড়িবার সময় বৃদ্ধ জেলে পুনরায় মহাজন বাবুকে অনুরোধ করিল যে, তিনি যেন আমাকে বিশেষ যত্ন করেন। চলন্ত ট্রেণের সঙ্গে কিছুদুর আগাইয়া গিয়া, পরে সে দাঁড়াইয়া থাকিয়া এক দৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া থাকিল। যতক্ষণ দেখা গেল, ততক্ষণ আমিও তার প্রতি তাকাইয়া থাকিলাম। ভাবে বোধ হইল, বৃদ্ধ আজ যেন তার আদরিণী কন্যাকে বিদায় দিতে আসিয়াছে। ক্রমে

ক্রমে ট্রেণের গতি দ্রুত হইতে দ্রুততর হইল। বৃদ্ধকে আর দেখা যায় না, তার মূর্ত্তি অদৃশ্য হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমার চক্ষু দিয়া কয়েক ফোঁটা জল বাহির হইয়া পড়িল।

মহাজনটী আমার প্রতি তাকাইয়া বলিলেন, "লোকটী বড় ভাল।"

আমি মনে মনে ভাবিলাম নীচ নমঃশূদ্র না হইলে, সে ও বোধহয় আজ আমাকে পায়ের নীচে পিষিয়া মারিত! কিন্তু ধীবর...আহা! সে প্রকৃতই একজন সত্যকার মানুষ।"

বেলা তখন দুইটা।

রাণাঘাট ষ্টেশনে ট্রেণ আসিয়া পৌঁছিল। চারিদিকে বিষম হট্টগোলের মধ্যে রাণাঘাট শব্দটা আমার কর্ণের মধ্য দিয়া প্রবেশ করিয়া সজোরে বুকে গিয়া ধাক্কা দিল। সমস্ত শরীর আমার অবশ হইয়া গেল। মনে পড়িয়া গেল, এই ত রাণাঘাট। ইহারই সামান্য দূরে আমার শ্বশুরবাড়ী! হায়রে! সেখানে সব থাকা সত্ত্বেও, একজনের অভাবে, আজ আমার কিছুই নাই। আজ যদি আমার স্বামী থাকিত, তবে কি আমি এমন কাঙ্গালিনীর বেশে দেশে দেশে ঘুরিতাম, না বিপন্ন হইয়া নিরাশ্রয়ার মত অকূল সাগরে ভাসিতাম! সেখানে গেলে তাহারা যে আমাকে কোন মতেই আশ্রয় দিবে না, ইহা একেবারে ধ্রুব! বিধবা হইয়া সামান্য কিছুদিন পেট-ভাতায়, ঝি ও রাঁধুনীর দুই কাজই অতি বিশ্বস্ততার সহিত করা সত্ত্বেও রায়বাঘিনী শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট সুনাম লইতে পারি নাই, বরং সামান্য দোষে তিল কে তাল করিয়া তিনি আমার

সমস্ত বিষ্ মুড়া ঝাঁটার দ্বারা ঝাড়িয়া দিয়াছেন! আজ যদি এই কলঙ্ক পসরা মাথায় করিয়া সে বাড়ীতে আশ্রয় প্রার্থীর বেশে দাঁড়াই, তাহা হইলে এ অভাগী কি আর প্রাণে বাঁচিবে! শ্বশুরবাড়ীতো দূরের কথা, শ্বশুরবাড়ীর গ্রামের সন্নিকটে যাইলেই সকলে দলবাঁধিয়া আসিয়া শিয়াল কুকুরের মত আমাকে তাড়াইয়া দেশছাড়া করিয়া দিবে। কেনই বা দিবে না? নিজের মা, ভাই যখন সাহস করিয়া আশ্রয় দিতে পারিলেন না, তখন স্বামীহীনা কলঙ্কিতা নারীর শ্বশুরবাড়ীতে স্থান পাওয়ার কথা ভাবা, বাতুলের আষাঢ়ে স্বপ্ন ভিন্ন আর কি বলিব?

সঙ্গে সঙ্গে মানস নেত্র-দেশের বাড়ীর দিকে ছুটিয়া গেল।

এই রাণাঘাটের সাত আট ক্রোশ দূরেই তো আমার জন্মভূমি। সেখানে আজন্ম পরিচিত গ্রামের সমস্ত রহিয়াছে; কিন্তু হে পরমেশ্বর! আমি কি আর সেথায় যাইতে পারিব না!...মা কি আমার কথা ভাবেন? নিশ্চয়ই ভাবেন। মা কি কখন বত্রিশ নাড়ী-ছেঁড়া ধন পেটের সন্তানকে ভুলিতে পারেন? মা হয়ত আমার শোকে, আর সে মা নাই। শোকে তার শরীর হয়ত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আহারে তাঁর কি আর রুচি আছে? বিশেষতঃ যে সকল জিনিষ আমি খাইতে ভালবাসিতাম, সে সকল কি আর তিনি মুখে তুলিতে পারেন? এই হতভাগিনী কন্যার কথা তাঁর ত দিবানিশিই মনে হইবে! আমার স্মৃতি যে সে বাড়ীর চারিদিকে ছড়ানো! নীরবে রোদন ছাড়া অসহায়া পরাধীনা জননী আর কি করিবেন? দাদা যখন শিক্ষিত পুরুষ হইয়া, সমাজের অন্যায় অত্যাচার নীরবে মাথা পাতিয়া লইলেন, তখন পরাধীনা

মায়ের আমার কি এমন সাধ্য যে ছুটিয়া আসিয়া সমাজ-পরিত্যক্তা হত-ভাগিনী কন্যাকে বুকে জড়াইয়া ধরেন ?

আমি নিজের চিন্তাতে আন্‌মনা আছি, কোনোদিকে আমার লক্ষ্য নাই। সহসা মহাজন বাবুর কথাতে আমার চমক ভাঙ্গিল।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখছ মা, তোমার সামনে বেশ ফিট্ ফাট্ তিনচারিটি ছোকরা, তোমার দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে আছে। তুমি কি ওদের চিন্‌তে পার ? ওরা নিশ্চয়ই তোমার ছেলে-টেলে কেউ হবে। নইলে এমন ব্যাকুল হ'য়ে ঘন ঘন তোমার মুখ পানে চাইতে পারে ?

এই বলিয়া তিনি খুব জোরে হাসিতে লাগিলেন। তাঁর কথার ঝাঁজ বোধহয় সেইসব যুব সম্প্রদায়ের-কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, কেননা, আমি দিব্য দেখিলাম, মহাজন বাবুর উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে সঙ্গেই তাহারা দৃষ্টি ফিরাইয়া লইল।

তিনি তাহাদিগকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিলেন,—"আরে হতভাগারা তোদের ঘরে কি মা, বোন নেই, তাদের কি ঘরে আর দেখতে পার্‌নি, তাই সব কষ্ট ক'রে এতদূরে এই রেলষ্টেশনে ঘুরে ঘুরে তাদের দেখতে আসিস্ ?"

তারপর তিনি আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি দেখছি, আজ কাল কোন যুবতী, বিশেষতঃ রংটা তার যদি ফর্সা হয় পথে চল্লেই দেখবে, দুই ধারের অনেকগুলো জ্বল্‌জ্বলে চোখ তার দিকে হাঁকরে গিলে খেতে আসচে ! আরে বাবু দেখবি দেখ্, তাতে ক্ষতি কি ? তবে দেখারও ইতর বিশেষ আছে, সেকি কেহ বোঝে না ভাবিস ? এইসব ডেঁপো

ছোঁড়ারা পরের মেয়ে-ছেলেকে দেখবে বলে দলবেঁধে বিনা কারণে, ষ্টেশনে এসে ভিড় করে।

জান্‌বে মা, আমি ঢের দেখেছি, হতভাগা সব কুলাঙ্গারের দল, এমন ভাবে, অসভ্যের মত অঙ্গভঙ্গি করে তাকিয়ে দেখে, যে চোখপড়লে তাদের সাত পুরুষের ওপর ঘৃণা জন্মে যায়। আমাদের দেশের মেয়েরা জড়ভরত, যদি কোন স্বাধীন দেশের স্বাধীন মহিলাদের কাছে এইরূপ ব্যবহার ওরা দেখাতো, তাহলে তৎক্ষণাৎ নিজের পায়ের জুতো খুলে, ওদের ওই স্নো পাউডার মাখা মাজা ঘসা প্যাচার মত চাঁদমুখ গুলো ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিত। ভেতো-বাংলা বলেই এই সব শোভা পাচ্ছে।"

১৫

শিয়ালদহে গাড়ী আসিয়া থামিল।

বিরাট ষ্টেশন; অগণিত নরমুণ্ড! ঠিক যেন জল স্রোতের ন্যায় নরনারী বাহিরের দিকে ছুটিয়াছে।

আশ্রয়দাতা মহাজন আমাকে বারংবার সাবধান করিতে লাগিলেন। দেখিলাম কতকগুলি লোক তাড়াতাড়ি বাহির হইবার জন্য, দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হইয়া, সম্মুখে যাহাকে পাইতেছে তাহাকেই ধাক্কাদিয়া চলিয়া যাইতেছে। আর কতকগুলি লোক, তাহারা বেশীর ভাগই যুবক, সুবিধা পাইলেই, যুবতী স্ত্রীলোকের উপর হুমড়ী খাইয়া পড়িয়া, নারী

স্পর্শ সুখ অনুভব করিতেছে। তাহাতে তাহাদের কতটুকু সুখ তা তাহারাই বলিতে প্যারে!

আমি এইরূপ দুই সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই ধাক্কা খাইতে লাগিলাম আর মনে·মনে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। আমার এইরূপ বিপন্ন অবস্থা দেখিয়া, মহাজন বাবু বাধ্য হইয়া অমার একখানি হাত ধরিয়া, তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেন, এবং ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া নিজের বাটী শ্যামবাজারের দিকে রওনা হইলেন।

গাড়ী তাঁর বাটীর দরজার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়োয়ানের ভাড়া মিটাইয়া দিয়া, আমাকে লইয়া তিনি বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দিব্যি মাঝারী ধরনের দোতালা বাড়ী। পরিষ্কার ঝক্ ঝক্ করিতেছে। দেখিলে গৃহস্বামীর সুরুচির পরিচয় পওয়া যায়।

প্রবেশ পথেই গৃহিণীর সহিত দেখা! মহাজন বাবুর ইঙ্গিত মত আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনি তখন বারান্দার একপার্শ্বে বসিয়া, রৌদ্রে চুল শুকাইতে ছিলেন এবং মুখের মধ্যে একগাল পাণ-দোক্তা পূরিয়া ধীরে ধীরে জাবর কাটিতে ছিলেন।

আমি তাঁহাকে প্রণাম করিতেই, আমার দিকে খানিকক্ষণ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া; মহাজন বাবুকে একটুখানি বিরক্তির সহিতই জিজ্ঞাসা করিলেন, “এটী আবার কে?”

তিনি বেশ মোলায়েম করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, “নিরাশ্রয়া স্বজাতীয়া বিধবা। ত্রিসংসারে আপনার বলতে কেউ না থাকায়, বাধ্য হয়ে

সঙ্গে এনেছি। গৃহিণী পার্শ্বে রক্ষিত পিক দানিটি বাঁ হাতে তুলিয়া পাকি পোয়াখানেক পাণের পিক তাহার মধ্যে ফেলিয়া পিকদানিটি যথাস্থানে রাখিতে রাখিতে বলিলেন, এমন অনাথা অনেক আছে। কত লোককে তুমি নিয়ে এসে আশ্রয় দেবে? আর ক'লকাতায় যে সব মেয়ে আসে, তাদের কি আর জাতের ঠিক আছে, না স্বভাব-চরিত্তির ভাল আছে?"

মহাজনবাবু তখন রীতিমত বিস্ময়ের স্বরে বলিলেন, "বল কি, আমি কি এমনি বোকা যে, না জেনে শুনে যাকে তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে বাড়ী এনেছি।...ঐ যে গো, কুটুম্বর কাছে থাকে...তোমার যেন কি-রকম বোন হয়। সেই যে সেবার আলাপ হ'লে যাদের বাসায় গিয়ে উঠে-ছিলাম।"

গৃহিণী আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "ওঃ আমার মাসতুত বোন নরুর কথা বলছ? তা তাকে সেই ছোট বেলায় দেখেছি, আর কখনও তো দেখতে পেলাম না। এবার সুধীরের বিয়ের সময় আনতে হবে কিন্তু বলে রাখছি।"

মহাজবাবু তখন উৎসাহের সহিত বলিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই সেই সেই নরুই!...মেয়েটি কে জানো? তোমার সেই ভগ্নীপতির নিকট আত্মীয়া। আপন ব'লতে একজনও আর বেঁচে নেই। আহা, মায়ের খাবার বড় কষ্ট। কি করি, যখন গিয়ে পড়লাম তখন তো আর দেখে শুনে আপনার লোক হ'যে ফেলে আসা চলে না। তাই বাধ্য হয়ে নিয়ে আসতে হ'ল। কুটুম্বর মেয়ে যে দুটো ভাতের জন্যে অন্য জাতে চ'লে যাবে তা তো আর সহ্য করতে পারি না। তাতে যে

আমাদের বদনাম বেশী। লোকের মুখে তুমি হাত চাপা দিয়ে ক'দিন রাখতে পারবে?"

তাঁরই সম্পর্ক হিসাবে আমাকে আনিয়াছেন জানিয়া, গিন্নীর মুখ-চোখের ভাব অনেকখানি বদলাইয়া গেল। বেশ মোলায়েম সুরে, কতকটা যেন মুরব্বির চালে তিনি বলিলেন, "তা বেশ করেছ। আমাদের যখন পাঁচ জায়গায় পাঁচ জনের কাছে মান খাতির আছে, তখন কি আর দেখে-শুনে ফেলে আস্তে পারা যায়?"

তারপর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন; "তোমার নাম কি গা, মেয়ে?"

আমি মহাজনবাবুর শিক্ষামত বলিলাম, প্রমীলা।"

তিনি বলিলেন, "তোমার এ-দশা কত দিন হয়েছে?"

—"প্রায় তিন বৎসর"।

তখন মহাজনবাবুর স্ত্রী সহানুভূতির সুরে বলিলেন, "তোমার আর কে আছেন?"

এই কথা শুনিয়া, আমার চক্ষের জল হু-হু করিয়া ঝরিতে লাগিল। অতীত ও বর্ত্তমান জীবনের সমস্ত ঘটনাই বায়স্কোপের ছবির মত আমার চোখের সামনে একটির পর একটি করিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আমি চোখে মুখে আঁচল চাপা দিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া, গৃহিণী থতমত খাইয়া, অনেকখানি যেন অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। কর্ত্তাও দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "তোমার একটুও কি বুদ্ধি নাই। আপনার লোক কেউ থাকলে, ঘরের বৌ-ঝিকে একমুঠো ভাতের জন্যে পরের বাড়ী পাঠায়?"

কর্ত্তার কথায় গৃহিণীকে এই খানেই বাধ্য হইয়া থামিতে হইল। তিনি দয়া করিয়া আমাকে বার বার বুঝাইয়া দিলেন, এর নাম কলিকাতা সহর, তোমাদের সেই অজ পাড়া গাঁ নয়। এখানে যা দেখবে সমস্তই নতুন। বল্‌তে কইতে খেতে শুতে, চ'লতে ফিরতে সব কাজেই সতর্ক হ'য়ে থাকতে হবে। নইলে ক'ল্‌কাতা সহরে তুমি এক মিনিটও দাঁড়াতে পারবে না, বাছা। এখানকার নিয়ম কি জানো? গরুর গাড়ীর তলায় চাপা পড়লে জরিমানা দিতে হয়। পুলিশে থানায় ধ'রে নিয়ে যায়।

মহাজনবাবুটি ভালই ছিলেন। গৃহিণীও যে মন্দ ছিলেন তা নয়; তবে পরের কথায় তাঁর কাণ ভারি হইত বিলক্ষণ। গতর কুঁড়ে মেয়ে-মানুষ, কিন্তু সর্ব্বদাই বাড়ীর লোককে জানাইতেন যে, তিনি যে দিক না দেখিবেন, সেই দিকই জাহান্নামে যাইবে। কাজে কাজেই বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা কর্ত্রী ও ম্যানেজার সাজিয়া সর্ব্ব বিষয়ে সর্ব্বত্র তদ্বির করিয়া বেড়াইতে হয়।

শ্যামবাজারের খালের নিকট মহাজনবাবুর পাটের গদি ছিল। তিনি প্রত্যহ সকালে উঠিয়া গদীতে যাইতেন এবং বেলা এগার-টার সময় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নান আহারাদি সারিয়া গদীতে গিয়া হাজির হইলে তিনি তখন বাড়ীতে আসিতেন। তারপর খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিছানায় গড়াইয়া লইয়া পুনরায় বেলা তিনটার সময় যাইতেন। এবং রাত্রি আটটা কি নয়টার সময় পিতা পুত্রে বাড়ী ফিরিয়া

আসিতেন। এই পুত্রটী ছাড়া তাঁহার আরও দুইটী পুত্র ছিল। মধ্যমটী সম্প্রতি ইস্কুল ছাড়িয়া ক্লাবের খাতায় নাম লিখিয়াছেন, ছোট পুত্রটি এখনও বিদ্যালয়ে পড়িতেছেন বটে, তবে আড্ডার আনাচে কানাচে ঘুরিতে সুরু করিয়াছেন। বেশী দিন আর বিদ্যালয়ের বাঁধাবাঁধির মধ্যে তাঁহার থাকিবার ইচ্ছা নাই।

আমি আসিয়া দেখিলাম, বাড়ীতে রন্ধনের জন্য একজন পাচিকা ওরফে 'বামুনদিদি', এবং বাহিরের বাসন মাজা কাপড় কাচা হইতে বাজারের মাছ তরকারী বহিয়া আনার জন্যে একজন ঠিকে ঝি আছে।

কুট্‌না কোটা, বাঁটনা বাঁটা, জল তোলা প্রভৃতি কাজগুলি বামুনদিদিকে নিজেই করিয়া লইতে হয়। তবে সখ করিয়া গৃহিণী কখন কখন কুট্‌নাটা কুটিয়া দিতেন।

আমি প্রথম প্রথম গিন্নীমার মন যোগাইয়া ফাই ফরমাস গুলি খাটীতে লাগিলাম এবং অবসর পাইলে বামুনদিদিকেও যথেষ্ট সাহায্য করিতে লাগিলাম। অদৃষ্টগুণে আমার কাজের শৃঙ্খলা দেখিয়া, গিন্নীমা সদয় হইলেন এবং তাহার ফল স্বরূপ সকাল ও বৈকালের জল খাবার তৈয়ারী করার ভারটা আমারই উপর পড়িল। তা ছাড়া মাঝে মাঝে ঝি বা বামুনদিদি গর হাজির হইলে, তাহাদের অভাব পূরণও আমিই করিতে লাগিলাম।

দিন কতক যাইতে না যাইতেই বামুনদিদির রান্নার অনেক দোষ আবিষ্কৃত হইয়া পড়িল। তরকারীতে সমান নুন হয় না, ডালটা প্রায়ই পুড়িয়া যায়। মাছের ঝোলের গুন্‌তি করা মাছের খান' তাও দু'চার খানা কমপড়ে, পাকি পাঁচ ছটাক তেলেও মাছ তরকারীর এ-পিঠ

ও-পিঠ সমানে ভাজা হয় না। এমনিতর কত দোষ...। বামুন দিদি যে মস্ত বদ্‌মায়েস হইয়া পড়িয়াছেন। গিন্নীমা আজ কাল তাহা হলপ করিয়া বলিতে পারেন। অগত্যা বামুনদিদিকে পেটের দায়ে দ্বিতীয় স্থান অনুসন্ধান করিতে হইল। এবং হেঁসেলের ভার সম্পূর্ণ আমারই উপর আসিয়া পড়িল। যেহেতু উক্ত স্থানের যোগ্যতা নাকি আমাতে দস্তর মত বিদ্যমান। ঠিকে ঝি দুই বেলা বাসন মাজিয়াই আর দুখানা কাপড় কাচিয়াই খালাস! প্রকৃত পক্ষে সংসারের যাবতীয় কাজের বোঝা আমাকেই মাথায় করিয়া লইতে হইল, এবং কচিৎ কখনো মাথাটায় ভার বোধ হইলে, বোঝা নামাইয়া একটুখানি বিশ্রাম লইবারও সুযোগ আর রহিল না।

গৃহিণী আমার উপর মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেও, কাজ কর্ম্মের জন্য, আমার উপর তিনি আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিলেন। মধ্যে মধ্যে আমাকে উৎসাহ ও সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি বলিতেন, "কি করব মা! তুমি কুটুম্বের মেয়ে। তোমাকে কি আর ফেল্‌তে পারি? বেতন ও দিতে পারি না। তবে ভালো ভাবে থাক, সঙ্গেনিয়ে তীর্থ-ধর্ম্ম করিয়ে আনবো।"

আমি মনে মনে ভাবিতাম, "তীর্থে আমার দরকার নেই! এক মুঠো স্বজাতির ভাত খাইয়া, মাথা গুজিয়া থাকিতে পাইলেই আমার মহাতীর্থের ফল ফলিবে।"

১৬

এখানে সুখে দুঃখে কোনো-রূপে দিন কাটিতেছিল; কিন্তু বিধাতার প্রাণে তাহাও সহ্য হইল না। যে রূপের জন্য আজ আমি পথের ভিখারিণী, পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি করিয়া এক মুঠা অন্ন সংস্থান করিতেছি, সেই রূপই এখানেও আবার আমার অন্তরায় হইয়া সত্য সত্যই এবার পথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল!

মহাজনবাবুর বড় পুত্রটী গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনিই বাড়ীর বড় ছেলে এবং পিতার কারবারের সহকারী। সম্প্রতি বিবাহও করিয়াছেন। বাহিরের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার মনে যে কখনো পাপ লালসার উদয় হইতে পারে, ইহা আমার স্বপ্নের অগোচর ছিল। তিনি প্রকাশ করিয়া কখনো কিছু বলিতেন না; তবে ইদানিং প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম তিনি সুযোগ পাইলেই একটু আধটু মুচকি হাসিয়া ইসারা ইঙ্গিতে আমায় বুঝাইয়া দিতেন, "ও গো, তোমার কোনো ভয় ভাবনা নেই। কেউ না থাক্ আমি একজন তোমার দরদি আছি।"

তাঁহাকে কোন প্রকারে এড়াইয়া চলিলেও, অপর দুইটি পুত্র ছিলো জোঁকের মত, আমার পিছনে লাগিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রটীর বয়স আন্দাজ বাইশ তেইশ বৎসর হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি কিছু-দিন হইতে বিদ্যালয় ছাড়িয় দিয়া রীতিমত আড্ডাধারী হইয়াছেন। পাড়ায় পাড়ায় শিস্ দিয়া ঘুরিয়া না বেড়াইয়া, যাহাতে সর্ব্বদা বাড়ীতে চোখের সামনে থাকে, সে জন্য গিন্নীমা বাবুর অনুমতি লইয়া বাড়ীর

বাহিরের ঘরটি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। রাত্রে তিনি সেখানেই শয়ন করেন। দিবাভাগের অবশিষ্ট সময় বন্ধুদের সহিত গান বাজনা, তাশ পাশা বা গল্প গুজব করিয়া সময় কাটান। কয়েকদিন হইতে তিনিও আমার উপর বিশেষ করুণা দেখাইতে লাগিলেন। এমনকি তাঁহার করুণার লম্বা বহর দেখিয়া আমি ক্রমেই অস্থির হইয়া পড়িলাম। তিনি ইচ্ছা করিয়া, একলা খাইতে বসিতেন। বিশেষতঃ প্রতি রাত্রেই দেরী করিয়া খাইতে আসিতেন। যাহাতে আমাকে একলা পাইয়া দু'চারটী তাঁহার মনের কথা খুলিয়া বলিতে পারেন। তাছাড়া ছুতানাতা করিয়া ভিতর বাড়ীতে যখন তখন আসিয়া পাণ জল চাহিতেন। পাণ দিতে দেরী হইলে সবুর সহিত না, যেখানে বসিয়া পাণ সাজিতাম, সেখানেই আসিয়া হাজির হইতেন ; এবং পাণ লইবার সময় একবার এদিক ওদিক চাহিয়া আমার হাতটা মৃদুভাবে টিপিয়া দিতেন। হয়তো সিঁড়ি দিয়া নাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ তাঁরও উপরে যাইবার প্রয়োজন হইত, এবং সিঁড়ির মধ্য পথে আমাকে মৃদু একটা ধাক্কা না দিলে তাঁর সুখ হইত না। দিনে-রাতে ঘন ঘন তাঁহার রাজদরবারে আমার ডাক পড়িতই। আমার তখনকার অবস্থাটা যে কি রূপ দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অপনারাই অনুমান করিয়া লউন।

এইরূপে তিনি ক্রমে ক্রমে নানাভাবে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমার নিকট কুপ্রস্তাব করিতে আরম্ভ করিলেন! তারপর তাঁহার লীলাখেলা প্রকাশ্যেও দু'একদিন চলিল। তিনি একদা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, 'এত সতীপনা তোমার থাকিবেনা। প্রথমে এইরূপ ভিজে বিড়াল সকলেই থাকে। তারপরে আস্তে আস্তে ধরা দেয়। অবশ্য একথাও

তিনি জানাইতে ভুলিলেন না যে, স্বজাতীয়া বিধবার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার কোমল প্রাণ দয়ার বিগলিত হইয়াছে। তিনি আমার সকল প্রকার কষ্ট মোচন করিতে সততই প্রস্তুত। যদি সমাজে চলন থাকিত কিম্বা চলন না থাকিলেও, মা যদি রাজী হইতেন, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই তিনি আমাকে বিবাহ করিয়া এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীদের সৎসাহস দেখাইয়া দিতেন। কিন্তু এ যে হিন্দু সমাজ! তবু তিনি মনে প্রাণে যেমন আমাকে এখন ভালবাসিয়াছেন, সেইরূপ চিরকালই ভালবাসিবেন ইহাতে আর এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটিবেনা। তাঁহার এ-কথা একেবারে বেদবাক্য! আমি যেন এখন হইতে প্রতি রাত্রেই দয়া করিয়া, কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে বাড়ীর সকলে যখন ঘুমাইয়া পড়িবে, সেই সময় তাঁহার ঘরে পায়ের ধুলা দিই।

বড় মেজ হইতে ছোটটার কামড়ে আমাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বয়স সতর আঠার। মা'র কাছে দুধের ছেলে। কিন্তু সোণার চাঁদ দুধের বাছা যে এঁচড়ে পাকিয়াছেন, সে সুসংবাদ বাপ-মা মোটেই অবগত ছিলেন না। 'ইস্কুলের পড়া পড়িতেছি বলিয়া, পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে লুকাইয়া সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুটি বটতলার যত বাজে উপন্যাস পড়িত। বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছেলে, অর্থাৎ 'ছেলে মানুষ' বলিয়া, আমার কাছে তার অবারিত দ্বার। সে সুবিধা পাইলেই আমাকে ইঙ্গিতে অনেক কথাই বলিত। কিন্তু আমি বুঝিয়াও না বুঝার মত চুপ করিয়া থাকিতাম।

একদিন সেই ইস্কুলের কোচি খোকাটি বলিয়া বসিল, "আচ্ছা প্রমীলাদি, রাত্রে একলা শুয়ে থাকতে তোমার কষ্ট হয় না?"

আমার খুবই হাসি আসিল; কিন্তু মুখে প্রকাশ না করিয়া গম্ভীর ভাবে বলিলাম, "কষ্ট হবে কেন? চিরকাল তো আমি একলাই থেকে আসছি।"

সে একটু উৎসাহের সহিত উত্তর করিল, সে তখন উপায় ছিল না—দেখবার লোক ছিলনা তাই, এখন তো আমরা সব র'য়েছি বল তো রাত্রে তোমার ঘরে শুতে যাই, এই ত পাশের ঘর।"

আমি মনের রাগ মনেই চাপিয়া রাখিয়া প্রকাশ্যে ঈষৎ ভৎসনার সুরে বলিলাম, "তুমি এখন ইস্কুলে পড়ছ, এমনধারা অকথা কুকথা বলতে তোমার লজ্জা করে না! যদি ভাল ভাবে না চল, তবে বাধ্য হয়ে তোমার মা বাপকে আমাকে জানাতে হবে।"

"আমি তোমার যাতে ভাল হয়, তারই জন্যে বলেছি।" এই কথা বলিয়া হাসিতে হাসিতে তখনকার মত সে চলিয়া গেল। একটি ক্ষুদ্র বালকের এ-হেন কাণ্ড দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম! ঘুণধরা বাঁশের এত তেজ। ইহারই নাম কলিকাল!

সেই দিন হইতে বিশেষ সাবধানে চলিতে লাগিলাম। বিশেষতঃ রাত্রিকালে! শোবার সময় তো বটেই।

বিধিলিপি অলঙ্ঘ্য। খণ্ডাইতে কেহ পারে না! আমার ভাগ্যে বিধাতা পুরুষ বিরলে বসিয়া যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কে

খণ্ডন করিবে? অকস্মাৎ একদিন এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহার জন্য স্বজাতীর বাড়ীর দাসীবৃত্তি হইতেও আমাকে বঞ্চিত হইতে হইল।

কাজ কর্ম্ম সারিয়া রাত্রে শুইতে যাইতে আমার প্রায়ই সাড়ে এগারটা, বারটা, বাজিত। সমস্ত দিন গাধার মত খাটুনির পর, তারপর তেলপাকা বালিশটা মাথায় দিয়া ছেঁড়া মাদুরটার উপর এলাইয়া পড়িতে না পড়িতেই আমি অকাতরে ঘুমাইয়া পড়িতাম।

প্রতিদিনের মত আজো দরজা বন্ধ করিয়া শুইয়াছি। গভীর নিদ্রা বোধকরি তখনো আমার আসে নাই, সবে তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে মাত্র, এমন সময় যেন কাহার আকস্মিক স্পর্শে আমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! ঘর অন্ধকার। ভয়ে আমি চীৎকার করিয়া উঠিলাম, তখন গুণধর পরিপক্ক এঁচোড় বাবুটি অর্থাৎ ছোট ছেলেটি, বলিয়া উঠিল, "কী ছেলেমানুষের মত চীৎকার কর, আমি, আমি!"

আমি তাহার গলার আওয়াজ পাইয়াই হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলাম। তাহার হাত খানা জোরে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলাম, "এত বড় তোমার সাহস! ঘরের মধ্যে শুয়ে ছিলাম, কি করে তুমি ভেতরে এলে? জাননা...লাথিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব।"

আমার পাশের ঘরেই কর্ত্তা-গিন্নী থাকিতেন। আমার চীৎকার শুনিয়া গিন্নী বকিতে বকিতে উঠিয়া আসিলেন। দরজা খুলিয়া দিলাম। তাঁর হাতে আলো ছিল। যেই আমি ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়াছি, অমনি খাঁচা হইতে উড়িয়া পালানোর মত ফুরুৎ করিয়া শ্রীমান দুধের বাবাজীবন বাহির হইয়া গেল।

গিন্নীমা আমাকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করাতে, রাগের মাথায় সমস্ত সত্য ঘটনাই আমি বলিয়া দিলাম।

মহাজন গিন্নী তখন তাঁহার গুয়ো ছেলেটির নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কথা সত্য কি না ?

পুত্ররত্ন অম্লান বদনে উত্তর দিল, "আমি কি করব, প্রমীলাদি ডেকেছিলেন, তাই আমি গিয়েছিলাম। তিনি ঘরের দরজা না খুলে দিলে, আমি কি ক'রে ভেতরে ঢুকবো ? তা ছাড়া ও-ঘরে, এই এত রাত্রিতে আমার দরকারই বা কি ?"

আমি তো অবাক ! এতটুকু ছেলের পেটে পেটে এতখানি শয়তানী বুদ্ধি ! মনে মনে ভাবিলাম সত্যিই তো, ঘরে কি ক'রে ঢুকলো ! এদিক-ওদিক তাকাইতে নজরে পড়িল, ঘরের অপর দিকের দরজাটী বরাবর বন্ধই থাকিত, আজ তা'র ছিটকানিটী খোলা ! বুঝিতে আর আমার বাকী রহিল না। গুণধর কোন্ সময়ে ঘরে আসিয়া উক্ত দরজার ছিটকানিটী খুলিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর নিত্যকার অভ্যাসমত ঘরে ঢুকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছিলাম, ওদিকে নজর দিবার এতটুকু সময় পাই নাই। ওদিকটা চিরকাল বন্ধই থাকে। কেহ কখনও খোলে না। কাজেই কি করিয়া আমার সন্দেহ হইবে !

১৭

মহাজন-গৃহিণী তাঁহার দুধের ছেলের বাক্য বেদ বাক্য বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালা-গালি দিতে লাগিলেন। আমি যে নষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোক অবশ্য এ-কথা তিনি বরাবরই জানিতেন; কিন্তু কি করিবেন; বাড়ীর কর্ত্তা বাহাত্তুরে—বুড়ো সঙ্গে করিয়া বাড়ী আনিয়াছেন বলিয়াই রাখিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন। যা হবার তা হইয়া গেছে। আর তিনি পাপের প্রশ্রয় দিবেন না। অদ্য রাত্রেই ঝাঁটা মারিয়া 'এ-পাপ' বিদায় করিয়া তবে পুনরায় শুইতে যাইবেন।

তাঁহার অন্যায় গালাগালিতে দুঃখও হইল, রাগও হইল,। মনকে ধিক্কার দিয়া মনে মনেই বলিলাম, "ভগবান! দুনিয়ায় দোষ দিব আজ কাহাকে? তোমার বিচারে যা আমি পাইয়াছিলাম, আজ তাহাও যদি যায়, সে-ও তোমারই সুবিচার ভাবিব। যাক্—চুলোয় যাক্ সব। নিজের মা, ভাই যখন আমার মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না। সমাজের শাসনে আমাকে এক কাপড়ে দূর দূর করিয়া বিদায় করিলেন, তখন 'পর' কেন আমার ঝক্কি সহ্য করিবে?" গিন্নীর কথার ঝাঁঝ আমাকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল। আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে বাহির হইয়া রাস্তায় নামিলাম।

মহাজন-গৃহিণী সদর্পে এবং সঝঙ্কারে সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

নারী হইয়া একবারও তাকাইয়া দেখিলেন না যে, ও নারীর কি গতি হইবে!

আমি প্রশস্ত রাজপথে দাঁড়াইয়া নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছি আর কাঁদিতেছি। রাত্রি যে কত হইয়াছে, তাহার কোন খেয়ালই নাই। এক সময় চাহিয়া দেখি, আমার ঠিক পাশেই, মহাজনবাবুর দ্বিতীয় পুত্র সুধীরবাবু দাঁড়াইয়া আছেন! তিনি বোধ হয় বাড়ীতে হৈ-চৈ শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিলেন। খুব সম্ভব আমার সমস্ত দুর্দ্দশাও তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। কিন্তু তখন বাড়ীর মধ্যে মা-ভাই-এর সামনে কোনো উচ্চবাক্য করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। এখন, এই 'নির্জ্জন পথমাঝে' আমাকে একাকিনী পাইয়া, রীতিমত সহানুভূতির স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "প্রমীলা, দুঃখ ক'রে কি হবে? যা কপালে ছিল তা তো হইয়া গেল! এখন কাঁদলে ত তা ফিরবে না। আমি জানি, তোমার কোন দোষ নেই, যত দোষ ঐ রাস্কেলটার! ইস্কুল-পালানো বয়াটে জানোয়ার, ও হতভাগাটাকে আমি ভাল করেই জানি। পাজীটা একেবারে বয়ে গেছে।"

আমার অত দুঃখেও মনের মধ্যে হাসি আসিল। প্রকাশ্যে বলিলাম, "আপনি কিসে বুঝলেন?"

তিনি অম্লান বদনে উত্তর দিলেন, "আমি নিজের দিক দিয়েই বুঝতে পারছি যে! দেখ প্রমীলা, তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না; কিন্তু সত্যিই আমি তোমাকে অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি, যাকে বলে দরদের ভালোবাসা! আমি যে তোমাকে কায়মনে সর্ব্বদার জন্যেই চাই, একথা সত্যিই, তা ব'লে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তো আমি দাঁড়াব না! যা

হবার তা হ'য়ে গেছে।.........কতক্ষণ আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে? এস, ঘরের ভেতর উঠে এস। কাল সকালেই তোমাকে একটা ভাল জায়গায় রেখে আসব। সেখানে তোমার একটুও অসুবিধে হবে না।"

আমি বলিলাম, "দেখুন, আমাকে ঘরের কথা ব'লে আর অপমান করবেন না। আমার ঘর ও বাহির দুই সমান। ঘরের দরজা আমার কপালে চিরদিনের জন্যই বন্ধ হ'য়ে গেছে। ঘর ব'লতে আমার আর কিছু নেই। আমি যখন প্রকৃত পক্ষে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছি, তখন দু'এক ঘণ্টার জন্যে ঘরে গিয়ে আর বসবো না। তা ছাড়া সত্যি কথা গোপন করবো না—আপনাকেই বা বিশ্বাস কি? আপনিও ত আমার এই তুচ্ছ রূপ ও যৌবনের জন্যেই দয়া দেখাচ্ছেন? আজ যদি আমি আশীবছরের বুড়ি কিম্বা দুনিয়ায় সব চেয়ে কুৎসিৎ হতাম, নিজের বুকে হাত দিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলুন তো, সত্যি সত্যিই কি তা হ'লে আপনার প্রাণে এ দয়াটুকু আস্‌ত?

আমার কথা শুনিয়া তিনি অনেকখানি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন। আমার প্রশ্নের আর কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। পরিশেষে বলিলেন, "যদি তুমি আমাকে অবিশ্বাসই কর, তবে ঘরে নাই বা এলে! আমি আজ ভগবানের নামে শপথ করছি, তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোনো দিন তোমার ওপর বল প্রকাশ করব না।"

আমি একটু হাসিয়া বলিলাম, "সে আপনার দয়া।"

সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। আমার এ কাল রাত্রিও কাটিয়া গেল। সুধীরবাবুও আমার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া, আমার

সহিত রাত্রি কাটাইলেন। গভীর রাত্রির এই স্তব্ধ নির্জ্জনতায় দুই তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত কথা বলিয়া আমার ভিতর বাহির অনেকটা হাল্কা হইয়া গেল। এবং ক্রমাগত সহানুভূতি সম্পন্ন কথা শুনিতে শুনিতে, তাঁহার প্রতি মনটাও যেন অনেকখানি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। সে কথা যদি এখানে না বলি, তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হয়।

কলিকাতায় আসিয়া মহাজনবাবুর পরিবার ব্যতীত তাঁহার বাড়ীর রাঁধুনী বামুনদিদি ও ঠিকা-ঝি ছাড়া অন্য কাহারও সহিত আমার আলাপ পরিচয় হয় নাই। দিবারাত্রি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীটির মত বাড়ীতেই আবদ্ধ থাকিতাম, বাড়ীর বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজনও কোনো দিন হয় নাই, যাওয়া উচিত কি অনুচিত সে চিন্তাও কোনো দিন আমার মনে আসে নাই। ভাবিলাম, ঠিকা-ঝি......ছোটলোকের মেয়ে, তাহার আশ্রয় না লইয়া বামুনদিদির আশ্রয় লওয়াই ভাল।। ব্রাহ্মণের মেয়ে, স্বভাব চরিত্র খারাপ হইলেও অবশ্যই মার্জ্জিত হইবে।

মনে মনে সংকল্প ঠিক করিয়া লইয়া, সুধীরবাবুকে বলিলাম, "আমাকে আপাততঃ আপনাদের সেই পুরাণো বামুনদিদির বাসায় নিয়ে চলুন। সেখানে উঠে, তার পর যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।"

সুধীরবাবু অতিসহজেই এ প্রস্তাবে রাজী হইয়া বলিলেন, "বেশ...... তাই চল। বামুনদিদি লোকটা নেহাৎ খারাপ নয়। আগে কি ছিল বলতে পারি না; তবে আজকাল তো দেখে শুনে ভালোই মনে হয়।"

অতি প্রত্যুষেই সুধীরবাবুর সহিত বামুনদিদির বাসায় চলিলাম।

তিনি আমাকে দরজার নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া বলিলেন, "প্রমীলা, এখন তা হ'লে আমি আসি। তুমি একটুও ভেব না। আমি সর্ব্বদাই

তোমার খোঁজ খবর রাখবো। যখন যা তোমার দরকার হবে, লজ্জা না ক'রে, আমায় বলবে। তুমি কোনো সময়ের জন্যেই ভুলে যেয়ো না প্রমীলা,—সর্ব্বদা মনে রেখ—আমি তোমারই।"

তাহার কথা শুনিয়া খুব বেশী রকম রাগ হইল। কিন্তু বর্ত্তমানে আর তাহা প্রকাশ করিলাম না। ভাবিলাম, "চটিয়ে লাভ কি? অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?"

অত সকালেও দেখিলাম, বামুনদিদির বাড়ীর সদর দরজা খোলা! সাহসে ভর করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, বামুনদিদি একখানি ছোট ঘর ভাড়া লইয়া বাস করেন। অনেকদিন হইতে তিনি এই বাড়ীতেই আছেন। বাড়ীওয়ালা তাঁহাকে যথেষ্ট খাতিরও করে; কারণ বাড়ীর কোনো ঘরখালি হইলেই তিনি ভাড়াটিয়া জোগাড় করিয়া দেন; এবং ভাড়ার তাগাদাও তিনিই করিয়া থাকেন। এই সব কারণে বাড়ীর মালিক ঘুঘী ময়রা, এ-হেন বামুনদিদিকে মাসীক দুই টাকা ভাড়ার স্থলে, মাত্র বার আনাতে বহাল রাখিয়াছেন।

খোলার বাড়ী, উঠানের চারিদিকে বারান্দা ও ঘর। প্রত্যেক ঘরে এক একটী পরিবার। প্রতি ঘরের সম্মুখের বারান্দাটুকুতে সকালে ও বৈকালে সেই ঘরের অধিবাসীর রান্না হয়, আর বাকী সময় বৈঠক-খানারূপে ব্যবহার করা চলে।

একটী ভাড়াটীয়া মেয়েকে জিজ্ঞাসা করিয়া ইতিপূর্ব্বে বামুনদিদির ঘরের সন্ধান পাইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার দরজার নিকটে আসিয়া ডাকিলাম; "বামুনদিদি!"

বামুনদিদির তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু বিছানা হইতে না

উঠিয়া গড়াগড়ি দিতেছিলেন, আর মুখে বিড় বিড় করিয়া খুব সম্ভব ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছিলেন।

আমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, এবং আমাকে দেখিয়াই একগাল হাসিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, "ও মা প্রমীলা যে...হঠাৎ কি মনে ক'রে? তুমি যে ভাই আমার কাছে, এ-বাড়ীতে কোনোদিন আসবে, সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। এস, এস, উঠে এস, ঘরের মধ্যে এসে বোসো।"

বামুনদিদি প্রথমেই আমাকে যেরূপ-ভাবে আদর করিয়া বসিতে বলিলেন, তাহাতে আমার সাহস হইল। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "বামুনদিদি, আজ থেকে আমি তোমার কাছে থাকব বলেই এখানে এলাম। অনেক কথা আছে। কিন্তু তুমি কি এখনই বেরোবে?"

—"না, আমার বেরোতে এখনো অনেক দেরী। এক সোণার-বেনে ডাক্তারের বাড়ী কাজ করি। তারা লোক বেশ ভালই। টাকাপয়সাও মন্দ দেয় না, ঝামেলা নেই একটুও। ডাক্তারবাবুটি খান বেলা বারটায়, কাজেই গিন্নীরও তাই। ছোট ছেলে দুটী ভাত মুখে করে না। সকাল সকাল গিয়ে কি করব? মনে করলে আমি অন্য এক বাড়ীতে ঠিকে কাজও করতে পারি; কিন্তু অত খেটে কি হবে? একটা তো পেট। দিব্যি চলে যাচ্ছে ভাই।"

আমি একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলাম, "বামুনদিদি, আবার বোধ হয় মহাজনবাবুর বাড়ী থেকে তোমার তলব আসবে!"

বামুনদিদি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "নেড়া বেল তলায় ক'বার যায়? পাগল নাকি! আমি যেন আবার সেখানে যাচ্ছি! সাত

জন্ম খেতে না পেলেও ওই তারকা রাক্ষুসীর বাড়ীতে আর হাড়ী ঠেলতে যাচ্ছি না। দয়া মায়া বলে কোন জিনিষ ওদের নেই ভাই। রাঁধুনীদেরও যে রক্ত-মাংসের শরীর সে-কথা ওরা একবারও ভাবে না। এক মিনিট ব'সে থাকতে দেখলে গিন্নীমাগী ধর্ম্মের ষাঁড়ের মত চীৎকার করবে! কাজ থাক আর না থাক চব্বিশ ঘণ্টাই হাঁড়ী হাতে নিয়ে থাকো। সকালে ন'টায় ইস্কুলের ভাত, দশটায় বড় ছেলের ভাত, তারপর কর্ত্তার পিণ্ডি বারটায়, গিন্নীর একটায় গান বাজনার পর মেজ ছেলেটির ফুরসং হবে আড়াইটেয় হেঁসেল সেরে নিজে খেয়ে উঠতে বেলা সাড়ে তিনটে। তারপর দু'এক ঘণ্টার জন্যে বাড়ী আসতে গেলেই অমনি গিন্নীঠাক্রুণ বলে উঠ্লেন, 'বামুনঠাকরুণ, একটু সকাল সকাল এসে জল খাবারটা তৈরী করো' ঝাঁটা মার অমন বাড়ীর চাকরীর মুখে। ওখানে যখন বাহাল হই, সে সময় হাতে কোনো কাজ ছিল না তাই। তা ছাড়া ওই বুড়ো মহাজনবাবুটি বড় ভদ্র। অনেক দিনের আলাপ, এসে ধরলে, কাজেই তখন না বলতে পারিনি। আমি ভাই নিজেই ছাড়ব ছাড়ব মনে করছিলাম, এমনি সময় তুমি এলে। গিন্নীও ছুতো নাতা ধরে আমাকে তাড়িয়ে দিলে। ভগবান যা করেন, ভালোর জন্যই করেন। যাক ও-সব কথা!...তা...তুমি যে হঠাৎ সব ছেড়ে ছুড়ে পালিয়ে এলে? ব্যাপার কি বল দেখি?"

আমি কোন কথা গোপন না করিয়া সমস্ত কথাই তাঁহার নিকট খুলিয়া বলিলাম। তিনি আমার কথা শুনিয়া বলিলেন, "দেখ প্রমীলা, তুমি বয়েসে আমার মেয়ে নাতনীর সমান। তোমার ব্যবহারে প্রথম থেকেই তোমাকে ভাল বেসেছি। তোমার যাতে হিত হয়, তার

চেষ্টা সর্ব্বদাই আমি করব। তবে একটা কথা, তোমার যে রকম কচি বয়েস, আর চোখঠিকরে পড়া রূপ, তাতে তোমাকে যে কোনো খানে শান্তিতে কাজ করতে দেবে, তা বলে মনে হয় না। আমি জীবনে অনেক ভোগানই ভুগেছি। আমি যে মেয়ে তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছি। অন্য কোন মেয়ে হলে সত্যি বলছি এতদিন কোথায় ভেসে যেত তার ঠিক ঠিকানা নেই।"

তখন আমি হতাশ ভাবে বলিলাম, "তবে এখন আমি কি করব, বামুনদিদি ?"

বামুনদিদি সান্ত্বনার সুরেই বলিলেন, "কি আর করবে? সাধ্য মত গতর খাটিয়ে ভাল ভাবে থাকবার চেষ্টা করবে। তাতেও যদি বিঘ্ন আসে, তবে জানবে, অদৃষ্টের লেখা আর ভগবানের তাই ইচ্ছা।"

তিনি বাড়ীর সমস্ত ব্যাপার বুঝাইয়া দিয়া, সঙ্গে করিয়া আমাকে স্নান করাইয়া আনিলেন। এবং রান্নার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বলিলেন, "এখন আমি চল্লাম ভাই। সকাল সকালই ফিরে আসব, এসে তোমার সঙ্গে সুখ দুঃখের কথা কইবো। তুমি শীগ্‌গির শীগগির রান্না ক'রে দুটো খেয়ে নিয়ে বিছানায় গা গড়াও! ভাবনা কি? গতর খাটালে আবার ভাতের ভাবনা ?"

বামুনদিদি হেলিতে দুলিতে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। আমি অল্প সময়ের মধ্য আরও দু'চারিটি মেয়ের সহিত আলাপ করিয়া এ-বাড়ীর অনেক তথ্যই সংগ্রহ করিলাম।

খোলার বাড়ী, পনের ষোলটি কুঠুরী। বামুনদিদি ছাড়া প্রত্যেক কুঠুরীতেই এক একটি কর্ত্তা গিন্নী লইয়া পরিবার। দু'চারিটি পরিবারে

ছেলে মেয়েও আছে। বাকী সমস্তই স্বামী স্ত্রী। একটি স্ত্রীলোকের সহিত আলাপ হইল। দেখিয়া বোধ হইল, সরল, নিরীহ ও সকলের অপেক্ষা গরীব। বাড়ীর মালিক প্রত্যেক ঘর পিছু অন্যের কাছে দুই টাকা করিয়া মাসিক ভাড়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কেবল বামুনদিদির সুপারিশে ভদ্র কায়স্থ গরীব পরিবার বলিয়া ইহাদের নিকট দেড় টাকা করিয়া লন। স্বামী তাহার কোনো এক দোকানের মুহুরী। বেতন মাসিক বারো টাকা। ভরণ পোষণ করিতে স্ত্রী ও চারিটি পুত্র কন্যা। স্ত্রীলোকটি বলিতে লাগিল, "কি জান ভাই, সকলেই ত আর রাণী হয় না! দুঃখ সইবার জন্যেও তো সংসারে লোক চাই! আগে এঁর অবস্থা ভালই ছিল। কাল মামলায় আর অসুখের সময় ডাক্তার বদ্যিকে দিতেই সর্ব্বস্ব গিয়েছে। বেশী লেখা পড়াও ত জানেন না, কাজেই দোকানের মুহুরী গিরী ছাড়া আর করবেন কি? আমিও ভাই ব'সে থাকি না। সময় পেলেই কাগজের ঠোঙ্গা তৈয়ার করি। তাতে মাসে আমার দু'তিন টাকা হয়। উনিও সময় সময় অন্য ছোট দোকানে খাতা লিখে মাসে তিন চার টাকা উপায় করেন। এই তো যৎ সামান্য আয়, কিন্তু খানেওয়ালা আমাদের মোট ছ'য়টি। কাজেই আমরা স্বামী স্ত্রী প্রায় এক বেলা খাই। ছেলে মেয়েদের পাতের গোড়ায় কোনো রকমে কায় ক্লেশে দুই বেলা ডাল ভাত দিই। ছেলে মেয়েদের পেট ভরে খেতে দিতে না পারলে, বাপ-মার প্রাণে যে কি কষ্ট হয়, সে কথা আর কি বলব ভাই! এক এক বার ভাবি ওদের কপালে কষ্ট আছে ব'লেই তো গরীবের ঘরে জন্মেছে! বড় ছেলেটিকে পড়তে দিয়েছি ভাই। কায়স্থের ছেলে, লেখা পড়া না শিখলে কি ক'রে

খাবে? আজ কাল গরীবের ছেলের লেখা পড়া শেখাই দায়! একেত ইস্কুলের মাইনে বেশী, তারপর বছর বছর এক গাদা করে নতুন নতুন বই! গরীবের ছেলেরা পরের কাছে পুরাতন বই চেয়ে পড়বে, সেটী হবার যো নেই! গরীবের কষ্ট যে সব দিক দিয়েই।"

আমি হাঁ করিয়া, তাহার সকল কথা শুনিতে ছিলাম। তাহার মুখ দেখিয়া আমার বোধ হইল, কত দুঃখ কষ্টই যে অন্তরে তাহার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে! দমকা একটু হাওয়া পাইলে এখনই হয়তো বর্ষণ সুরু হইবে!

কথার সুর অন্যদিকে ফিরাইবার মতলবে আমি তাহাকে বলিলাম, "তোমরা কায়স্থ, আমার স্বজাতী! এ জগতে আমার আপনার বলতে কেউ নেই। বড় দুঃখেই ঘরের বাইরে এসে পড়েছি। এখানে যত দিন আছি, নিজের ছোট বোন মনে করে মনে রেখো দিদি।"

সে বলিল, "ও কথা ব'ল না ভাই। জগতে পরই তো বেশী আপন হয়, আর যারা অতি আপনার, তারাই পর হ'য়ে যায়। এই যে আমার স্বামী, যাঁকে নিয়ে দিন রাত ঘর করছি, তিনিও তো একদিন আমার কাছে 'পরই' ছিলেন। অথচ আজ কত আপনার হয়েছেন! তুমি আমার স্বজাতীয়া, তোমাকে সকল দিকে সাহায্য করাই আমাদের উচিৎ। যদিও আমরা খুব গরীব, তবু যখন যা তোমার দরকার হবে লজ্জা না ক'রে আমাকে জানিও, ভাই। আমি সাধ্যি মত তা পূরণ করবার চেষ্টা করব। কিন্তু সব আগে একটা কথা তোমায় ব'লে রাখি বোন, এ বাড়ীর ভিতরের সমস্ত খবর না জানা পর্য্যন্ত, যার তার সঙ্গে বেশী ঘনিষ্টতা ক'রো না।

তুমি নতুন লোক। বার থেকে চট্ করে কিছু বুঝবে না। কিন্তু ভিতরের খোঁজ নিলেই জানতে পারবে যে, এ বাড়ীর অধিকাংশ স্ত্রীলোকের স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল নয়। কি করব, আমাদের নিতান্ত অভাব, তাই কায় ক্লেশে মাথা গুঁজে এখানে পড়ে, আছি। তাছাড়া বামুনদিদি লোক ভাল, আমাদের একটু স্নেহের চক্ষেও দেখেন। অনেক বিপদে আপদে সাহায্যও ক'রে থাকেন। তাঁরই খাতিরে বাড়ী ওয়ালা কিছু কম ভাড়াও নেয়। সেই জন্যে আমাদের এখানে প'ড়ে থাকা। আর বামুনদিদির দাপটে, অন্য বাড়ীর 'হাফ্ গেরস্তদের' মত এ বাড়ীর হাফ্ গেরস্তরা তেমন বেশী কিছু গোলমাল করতে পারে না।"

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, "হাফ্ গেরস্ত জিনিষটী কি ?"

সে আমার দিকে তাকাইয়া, মুচ্‌কি হাসিয়া বলিল, "হাফ্ গেরস্ত মানে—বিবাহিত নয়, অথচ স্বামী-স্ত্রীভাবে এক সঙ্গে বাস করে যারা, তাদিগকেই এখানে হাফ্ গেরস্ত বলে। এই হাফ্ গেরস্ত পরিবার কলকাতা সহরেই বেশীর ভাগ দেখতে পাওয়া যায়। নকলকে আসল বলে চালাতে গেলে কলকাতার মতন এমন নিরাপদ ঠাঁই তো আর কোথাও তুমি পাবে না কিনা। সহরটা যত বড়, পাপের বহরটাও তেমনি সাগরের মত। দেশের সর্ব্ব প্রকার পাপ নদীর মত ব'য়ে এসে এখানে মিলিত হয়ে, প্রকাণ্ড এক পাপের সাগরে পরিনত হ'য়েছে। এখানে কত রকম পাপের কাজ কত যে গোপনে সমাধা হচ্ছে তার ঠিকানা নাই। কত শত পুরুষ কত শত কুলবধূর সর্ব্বনাশ ক'রে, এই কলকাতা সহরে এসে আশ্রয় নেয়। যত দিন হাতে পয়সা থাকে ততদিন স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করে। হাতের পয়সা ফুরুলে, অবলা নারীকে,

অকূল সাগরে, ভাসিয়ে দিয়ে পুরুষ মশায় নিজের জায়গায় সরে পড়েন। তখন সেই অভাগা নারী বাধ্য হয়ে, পেটের জন্যে অন্য পুরুষের আশ্রয় নেয়। কেউ বা বাজারে ঘর ভাড়া নিয়ে, অভিশপ্তা বার-বণিতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে। পল্লী অঞ্চল থেকে পালিয়ে আসা যত পুরুষ পরস্ত্রী নিয়ে এখানে আসে, তাদের মধ্যে খুব কম লোকই শেষ পর্য্যন্ত একসঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করে। কিন্তু যারা তা করে, মানে কেউ কারুকে ছাড়ে না,—তাদেরই বলে হাক্ গেরস্ত। এই তো একটুখানি আগে, তোমার সঙ্গে যে মেয়েটী গল্প করছিল, এবং আর সকলের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে ফিস্ ফিস্ করে দোষ দিচ্ছিল, তারই কথা যদি বলি, তো তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি বলিলাম, "কি রকম? কথা বার্ত্তায় তো মনে হ'ল সে যেন ও-ধরণের লোক নয়। ওই পাশের ঘরের বৌটির উপর অনেক দোষ দিয়ে বলছিল, যে 'এসেছিস্ ত মরতে বাড়ী থেকে পালিয়ে, বেশী কেলেঙ্কারী না করে চুপ ক'রে থাক। দিন-রাত পর পুরুষের সঙ্গে ঝগড়া কি ভাল? সাত পাকের সোয়ামী তো নয়! বেশী বাড়া-বাড়ি ক'রে বসলে হাত ফসকে পালাবে। তখন তোর তাঁতি-কুল তো গেছেই, বৈষ্ণব কুলও আর থাকবে না। তখন ঐ ঢলঢলে পড়া বয়স নিয়ে তুই কোথায় গিয়ে দাঁড়াবি'? এমনি ধারা আরও কত কি ওই মেয়েটিকে বল্লে, সে সব কথা ভাই মুখেও আনতে নেই।"

সে পুনরায় একটু মুচকি হাসিয়া বলিল, "উনি বলবেন না ত বলবে কে? জানোই তো, যে-প্রকৃতির লোক, সে সকলকে সেইরূপই দেখে। এ বাড়ীর সকলেই জানে, উনি সতী সাবিত্রীরও একধাপ উপরে।

যে দিন ওঁর সাত জন্মকার সাতপাকের স্বামীর ঝগড়া হয়, সে দিন এ বাড়ীতে টিকে থাকা আমাদের দায় হয়ে পড়ে।”

আমি বল্লাম, “ওদের মধ্যেও তা হ'লে ঝগড়া হয়?„

সে বলিল, “ঝগড়া হবে না? বিয়ে করা সাত পাকের স্বামীর সঙ্গেও এক ঘরে ঘর করতে হলে খুঁটি-নাটি হয়, আর এরা ত পর। সাময়িক উত্তেজনার বসে, রিপুর তাড়নায় যে অবৈধ সম্বন্ধ হয়, তার ফলও কোনোদিন ভাল হয় না ভাই। মোহ কেটে গেলেই, পরস্পরের সম্বন্ধ শেষ হয়ে যায়! ছাড়াছাড়ি হতেই হবে! হাজারে একটার হয় তো না হ'তে পারে। হাফ্ গেরস্তদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে জানতে পারবে, সমাজে কি ভয়ানক রকমের পাপের স্রোত বইছে! তবু একেবারে বাজারের বেশ্যা না হয়ে, অমনি ভাবে সংসার ধর্ম্ম করাও মন্দের ভাল। একসঙ্গে এমনি করে স্বামী স্ত্রীর মত বাস করতে করতে অনেকের মধ্যে প্রকৃতই ভালবাসা জন্মে' যায় এবং শেষ জীবন পর্য্যন্ত তারা সৎভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়। কারো কারো বা সন্তানাদি হয়ে প্রকৃতই সংসারি হ'য়ে পড়ে। সমাজের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব নৃত্যের চেয়ে এরকম হাফ্ গেরস্ত হয়ে থাকা ঢের ভাল।”

আমি অবাক হইয়া বলিলাম, “বলো কি দিদি,...ওমা! ওরা তা হলে স্বামী-স্ত্রী নয়? ছেলেটিকে দেখে মনে হয় ওরা সত্যিকার স্বামী-স্ত্রী!

সে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, “ছেলে আগেও হ'তে পারে, পরেও হ'তে পারে। সাধারণতঃ দেখা যায়, সন্তানাদি থাকলে, অল্প বয়সে, চরিত্র খারাপ হলেও, ছেলে-মেয়েদের মায়াতে বড় একটা কেউ ঘরের বাহির হয় না। আবার এমন কতকগুলো আছে, যারা ছেলেপিলে হলেও

কুলের বাহিরে যায়। কেহ সন্তান ঘরে রেখে আসে, কেউ আবার বা সঙ্গে নিয়ে যায়। কেউ কেউ ভাবে, 'আমি সমাজের বাইরে চ'লে যাচ্ছি আমিই যাই। ছেলেকে কেন মাটী করতে সঙ্গে আনি!' কেউ বা ভাবে শিশু সন্তান কাছে থাকলে যৌবনের আমোদে ব্যাঁঘাত ঘটতে পারে, কাজেই তারা ছেলেকে ঘরে রেখে আসে! অনেকের আবার সঙ্গে আনবার মতলব না থাকলেও, ঘরে দেখা শুনো করবার দোসরা লোক না থাকায়, বাধ্য হয়ে ছেলেকে সঙ্গে আনে। আবার অনেক নারী পাপের পথে পা দিলেও, সন্তানের মমতা ছাড়তে পারে না বলে তাকে নিজের কাছে কাছে রাখে। যে সব হাফ্ গেরস্ত মেয়েদের সন্তান আছে, তাদের মধ্যে কোনোটি তার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত। আবার কোনোটি বা উপপতির সংস্পর্শে জাত। ওই যে ওই কেলোর মার কেলো, ওটি হচ্ছে ওর মায়ের পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত। কেলোর মা ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও, ঘরে অন্য কোনো লোক না থাকায়, বাধ্য হয়ে কেলোকে সঙ্গে এনেছে। কেলো এখন আপন বাপকে চোখে না দেখতে পেলেও, আপশোষ করবার কিছু নেই! কেননা, নিজের বৈমাত্র ভাইকেই "বাবা" বলে ডাকছে। সে জানে সেই তার বাপ!"

ইস! এই সকল কথা শ্রবণ করিবামাত্র আমার সর্ব্ব শরীর ভয়ে ও ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। আমি কিছুক্ষণ হতভম্বের মত তাহার প্রতি চাহিয়া থাকিলাম। জীবনে কোনো দিন এমন ভয়ঙ্কর কথা আমি শুনি নাই। এ যে স্বপ্নেরও অতীত। বিমাতা হইলেও সে তো মা। সামাজিক বিধানে, আপন গর্ভধারিণী জননীর মৃত্যুতে যে ভাবে আচার নিয়ম মানিতে হয়, বিমাতার মৃত্যুতেও অবিকল তাহাই মানিতে

হয়। নিঃসন্তানা বিমাতা হইলে, তাহার মুখাগ্নিও করিতে হয়! অথচ এই সব···ছি ছি···ইহারা 'মা' নামেও কলঙ্ক দেয় এমন বিশ্রী ভাবে! আমি কিছুক্ষণ পরে একটুখানি প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলাম, "এটা কি সত্যি ই?"

সে বলিল, "খাঁটি সত্যিকথা ভাই। না হ'লে, নিজে মা হ'য়ে, এমন পাপ কথা মুখে উচ্চারণ করি! আমি ওদের সম্বন্ধে বেশ ভাল ভাবেই জানি। বাবুটীর বিয়ে করা স্ত্রীর বাপের বাড়ী আমার বাপের বাড়ীর গ্রামে! সে বেচারী এখান অবধি ধাওয়া ক'রেছিল। কত সাধ্যি সাধনা করলে হাতে পায়ে ধরলে কিন্তু কিছুতেই বাবুটির মন টললো না। কি করেই বা টলবে! কোনো দিন তো তার সঙ্গে ঘর করেনি। তার উপর এই কাল নাগিনী ঘাড়ে চেপে আছে। কাজেই তাকে আশ্রয় না দিয়ে, স্পষ্ট বলে দিলে—'ও আমার স্ত্রী নয়'।"

আমি বল্লাম, "আচ্ছা দিদি, এমন অঘটন সংঘটন হল কি ক'রে?"

সে বলিল, "এ দোষটা শুধু এদের ঘাড়ে চাপালেই চলবে না ভাই। এর জন্যে কতক দায়ী বাবুটীর পিতা, আর কতক দায়ী সমাজ। উপযুক্ত ছেলে বর্ত্তমান থাকতে তাঁর কি প্রয়োজন ছিল, বুড়ো বয়সে পুনরায় বিবাহ করার? যদি বল, সময়ে ভাত জল পাবেন না, তা হ'লে ছেলের বিবাহ দিলেই তো হ'তো। সেই ছেলের বিবাহ তাঁকে দিতে হল, কিন্তু কখন, না যখন সে পা পিছলে আছাড় খেয়েছে!

কালোপযোগী সঙ্গী, আজকালকার উপন্যাস, টকী-বায়স্কোপ, থিয়েটার প্রভৃতির করুণায় মনের উপর মানুষের যে প্রভাব বিস্তার করে, তাতে সংযমের বাঁধ কেটে গিয়ে এরূপ অঘটন ঘটাও বড় একটা

আশ্চর্য্য নয়। সেই জন্যেই তো সমাজের দোষ দিচ্ছিলাম। তবে কেলোর মা আর তার বৈমাত্র ভাইএর মত এমনি ধারা অস্বাভাবিক সম্বন্ধ বেশী দিন যে টিকে থাকতে পারে না এটা খুবই সত্যি কথা। আমার মনে হয় খুব শীগ্গির এদের ছাড়াছাড়ি হবে। আজকাল প্রায়ই দেখি, বাবুটী মেয়েটির ব্যবহারে মধ্যে মধ্যে বড়ই বিরক্ত হ'য়ে উঠেন। মেয়েটিও ছোটলোকের মত ঝগড়া করে, পাঁচজনের সামনে ভেতরের কথা বলে দেয়। এক একদিন ব্যাপার এমন চরমে ওঠে যে, বাড়ীশুদ্ধ লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে!

আমি উত্তরোত্তর বিস্মিত হইয়া উঠিতেছিলাম। মনের মধ্যে যে ঘৃণারও উদ্রেক হইতেছিল না, এমন কথা বলিতে পারি না! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা দিদি, এ বাড়ীর সকলেই কি এমনি?

"এখানে প্রায় সকলেই পরস্ত্রী নিয়ে সংসার পেতেছে। তবে খুব কটু সম্বন্ধ এ-বাড়ীতে কেবল এইটাই। আর ঐ যে কালো মোটা মত মেয়েটী দেখছ, বয়স আন্দাজ তিরিশ হবে, উনি স্বামীর মৃত্যুর পর নিজের দেবরকে সঙ্গে এনে এখানে সংসার ধর্ম্ম করছেন!"

"ওরা কি জাত?"

"ওরা তিলি। তিলি কেন—বামুন, কায়স্থ, বৈদ্যর মধ্যেও এ পাপটা তুমি অনেক পাবে। ছোট জাতের মধ্যে বিধবা বিবাহের চলন আছে। উঁচু জাতের মধ্যে তা নাই। কাজেই দশটা বাল বিধবা ঘর করতে করতে দু'একটা যদি ছিট্‌কে বাইরে এসে পড়ে, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।"

"আর সব?"

"আর সব পাড়ার প্রতিবেশী মেয়েদের নিয়ে পালিয়ে এসেছেন। সধবা বিধবা দুই শ্রেণীর স্ত্রীলোকই আছে। পুরুষদের মধ্যে—কেউ স্বজাতীর মেয়ে নিয়ে ঘর করছেন। কেউবা ভিন্ন জাতীর মেয়ে নিয়ে। এ যেন ভাই কলির নব বৃন্দাবন! খাওয়া-দাওয়ার বাছ-বিচার নিয়েও এটা যেন জগন্নাথ ক্ষেত্রের আনন্দ বাজার!"

১৮

মেয়েটির চারিদিকে নানা ঝঞ্ঝাট। আর সে বেশীক্ষণ বসিয়া আমার সহিত গল্প করিতে চাহিল না—নিজের কাজে চলিয়া গেল।

আমি তখন রান্নার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চাপাইয়া সবে জল ঢালিতেছি, দেখি এই বাড়ীরই একজন ভাড়াটে—ন্যাড়া, তাহার সঙ্গিনী নেড়িকে লইয়া, 'ড্রেস' করিয়া—অর্থাৎ কপালে তিলক কাটিয়া এবং গলায় ত্রিকণ্ঠিমালা পরিয়া, আহারান্তে পাণ চিবাইতে চিবাইতে ভিক্ষায় বাহির হইল। ন্যাড়ার হাতে আনন্দ-লহরী আর নেড়ির হাতে একতারা!

ইহারা নাকি দেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া বৈষ্ণব মতে কণ্ঠিবদল করিয়া সংসার পাতিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাল যাপন করার চেয়ে, এরূপভাবে সংসার ধর্ম্ম করা, সমাজের দিক দিয়া মন্দের ভাল।

আমি ইহাদের কথাই ভাবিতে ভাবিতে রন্ধন সারিয়া লইলাম এবং

আহার করিয়া বামুনদিদির ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর পাতিয়া শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িলাম।

বামুনদিদি কখন আসিয়াছেন তাহা জানিতে পারি নাই। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিলে দেখি, তিনিও ঘরের মধ্যেই উপস্থিত!

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম; "ক'টা বেজেছে. বামুনদিদি? কাল সারারাত্রি জেগেছিলাম কি না, তাই আজ বড্ড ঘুমিয়েছি।"

বামুনদিদি হাসিয়া বলিলেন, "বেলা পড়ে গেছে। ক'টাই বাজুক না, তাতে তোমার কি? অবিশ্যি আমাকে এখুনি বার হ'তে হবে বটে! এ বেলা তুমি কি খাবে?"

—"আমার ক্ষিদে নেই কিচ্ছু খাব না।"

"ওমা, তাকি হয়, একটু জল-টল না খেলে সারারাত্রি যাবে কি ক'রে? রাত-উপোসী থাকতে নেই। আচ্ছা রান্না-বান্না তোমাকে কিছুই আর করতে হবে না, আমিই আসবার সময় যা হয় কিছু নিয়ে আসবো।"

—"বামুনদিদি, এমনিভাবে একলা বসে থাকা বড়ই কষ্টকর। তার উপর তোমার ঘাড়েই বা কত দিন খাব? যা হয় একটা কাজ-কর্ম্ম চেষ্টা ক'রে তুমি দেখে দাও।"

—"ভাবনা কি, তোমার কাজের চেষ্টা আমি করছি। তবে দিনের দিন না হলে তো মিলবে না ভাই। তুমি একটুও লজ্জা করো না; যত দিন না হয়, ততদিন আমার কাছেই থাক। তোমাকে আমি নিজের বোনের মতই দেখি।"

—"যতদিন কাজ-কর্ম্ম না হয়, ততদিন কি তবে এমনিভাবে চুপ ক'রে বসে থাকব ?"

—"কথাটা সত্যি বলেছ ভাই ! কাজের লোক মিছিমিছি ব'সে থাকতে পারে না। আচ্ছা প্রমীলা, তুমি তো লেখাপড়া জান, তা কাজ না থাকলে বই-টই পড়লেই পার।"

"সে তো ভাল কথা বামুনদিদি ; কিন্তু বই-ই বা পাই কোথা ?"

—"আ—আমার পোড়াকপাল !......তোমার বামুনদিদি মনে করলে কি না যোগাড় করতে পারে ? আমার সঙ্গে এস। আমাদের এই গলিতে ঢুকতে ডানদিকে পাশ করা একটি খৃষ্টানী দাই আছে। তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। সে আমাকে 'দিদি'—'দিদি' ক'রে পাগল করে ! লোকও খুব ভাল, তার অনেক বই আছে। যখন যে বই তোমার দরকার হবে, নিয়ে এসে পড়বে।"

—"আচ্ছা চল," বলিয়া তাঁর সঙ্গ লইলাম। ভাবিলাম, ধাত্রীটির সঙ্গে আলাপ হইলে, মাঝে-মাঝে সময় অন্ততঃ গল্প করিয়াও কাটাইতে পারা যাইবে।

বামুনদিদির বাড়ী হইতে আট-দশখানা বাড়ীর পর, পাশকরা "মিড্‌ওয়াইফ্‌" মিস্‌ লিলি বিশ্বাস থাকেন। তিনি তখন বাইরের ঘরেই ছিলেন। আমরা যাইতেই অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। লক্ষ্য করিলাম, মিস্‌ বিশ্বাস বামুনদিদিকে বেশ খাতির করেন। অবশ্য কিছু পরে এই খাতির করার গোড়ার উদ্দেশ্য জানিতে পারিলাম ; শুধু অনেক দিন প্রতিবেশী হইয়া আছেন বলিয়া নয়, অনেক সময় বামুনদিদি তাঁর কাজের সুখ্যাতি করিয়া অনেক "কল" যোগাড় করিয়া দেন।

বামুনদিদির দৌলতে অনেকগুলি ভাল ভাল ঘর নাকি তাঁর বাঁধা হইয়া আছে! তাছাড়া ভাল খাবার টাবার কাহারও বাড়ীতে পাইলে, বামুনদিদি মিস্ বিশ্বাসকে না দিয়া কখনো খাইতেন না। কোন কারণে কোথাও জরুরী ডাক আসিলে, মিস্-বিশ্বাস রাত্রিকালে বাড়ীতে থাকিতেন না, সেই সময় বামুনদিদি তাঁহার বাড়ী আগ্‌লাইতেন। এই সব কারণে, দুই জনের মধ্যে বেশ সদ্ভাব ছিল।

বামুনদিদি আমাদের উভয়ের পরিচয় করাইয়া দিলেন।

মিস বিশ্বাস হাসিমুখে আমার বন্ধুত্ব স্বীকার করিয়া লইলেন, এবং অবসর সময়ে, তাঁহার নিকট আসিয়া সময় কাটাইতেও অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "আমি বেশী লোকের সঙ্গে মিশার সময় পাই না, এবং মিশতে আমার ইচ্ছাও করে না। এ পাড়ার যে কারো সঙ্গে ব'সে দুটো সুখ-দুঃখর কথা কইব, তেমন লোকও খুব কম দেখি। গরীব হোক্ আর যাই হোক্, যে দু'ধার জন আছে, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি খৃষ্টান ব'লে, বামুনদিদি ছাড়া আর কেউ আমার বাড়ীর চৌকাঠ মাড়ায় না। কিন্তু...তোমার ভাই সে সব কুসংস্কার নেই তো?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "যদি আমার সেই ভাবই থাকবে, তবে বাড়ী বয়ে, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে আসব কেন? পৃথক ধর্ম্মের জন্য মানুষ মানুষকে ঘৃণা করতে পারে সে মহা জ্ঞান আমার নেই, ভাই। আর দেখুন, সব ধর্ম্মের উদ্দেশ্যই যখন এক, তখন পৃথক নামের জন্য ঘৃণা-বিদ্বেষ আসবে কেন?"

তিনি সবিষাদে বলিলেন, "এই সোজা কথাটা ক'জন বোঝে? আবার যারা বোঝে, তারা গোঁড়ামি বা ভণ্ডামীর জন্যে সহজে স্বীকার

করে নিতে চায় না। যাক, ওসব কথায় এখন কাজ নেই। তোমার যখন ইচ্ছে হবে তখনই এসো ভাই। এলে আমি অত্যন্ত সুখী হ'ব। তার পর তিনি ইসারায় আলমারির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার যখন যে বইএর দরকার হবে নিয়ে যাবে।"

আমি দেখিলাম প্রায় ভাল ভাল সাহিত্যিকের পুস্তকেই আলমারি দুইটী ভরা। আমি তাহার মধ্য হইতে একখানি মোটা গ্রন্থাবলী বাহির করিয়া লইলাম। তিনি দেখিয়া বলিলেন, "ওমা! প্রথমেই ওই মোটা গ্রন্থাবলী! দু'চার দিন না আসার মতলব বুঝি! তা হচ্ছে না, প্রত্যেক দিনই তোমাকে আসতে হবে।"

আমি বলিলাম, "তার জন্যে আর কি? একটা কথা আছে, সেধো ভাত খাবি? না হাত ধুয়ে ব'সে আছি। আমি একলা থাকতে পারব না বলেই ত আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছি। বই এর কথা যদি বলেন, তবে জানবেন, বইত সর্ব্বদা পড়তে ভাল লাগে না। আপনার কোন্ সময় অবসর থাকে বলুন, আমি সেই সময়ই আসব।"

তিনি বলিলেন, "আমার সব সময়েই অবসর। আবার কাজ পড়লে সব সময়েই কাজ। যখনই ডাক আসবে তখনই যেতে হবে। শিশুদের ভূমিষ্ঠ হবার তো' কোনো নির্দ্দিষ্ট সময় নেই। সুতরাং আমারও নির্দ্দিষ্ট অবসর সময় কিছু নেই। তুমি এসে খোঁজ নিও, থাকি ভালই; না থাকি ফিরে চলে যাবে। এই ত তিন পা গেলেই তোমার বাসা।...কি বল?"

আমি আসিতে স্বীকৃত হইয়া, বইখানি লইয়া বাসাতে ফিরিয়া আসিলাম! বামুনদিদিও হেলিতে দুলিতে নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

রাত্রে বামুনদিদি হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "রাস্তা দিয়ে আস্‌ছিলাম, মহাজনের বেটা সুধীরের সঙ্গে দেখা হ'ল, বল্লে, 'বামুনদিদি প্রমীলা এক কাপড়ে তোমার কাছে গেছে। বড্ড কষ্ট হচ্ছে। এক জোড়া কাপড় কিনে দি, নিয়ে যাও। তারপর কি ভেবে তোমার সঙ্গে আমারও একজোড়া কিনে দিলে।

আমি বলিলাম, "কেন তুমি নিলে, বামুনদিদি ?

বামুনদিদি বলিলেন, "কেন নেব না ? তারা তোমাকে খাটিয়ে কিছু কি দিয়েছে ? তারকা রাক্ষুসির হাত দিয়ে কিছু না পেয়ে, তার ছেলের হাত দিয়ে যদি কিছু পাওয়া যায়, তো মন্দ কি ?

বামুনদিদি যদি রাগ করেন, এই ভাবিয়া আর কিছু উত্তর না দিয়া আমি চুপ করিয়া থাকিলাম।

পরদিন বামুনদিদি চলিয়া যাওয়ার পর, সকাল সকাল রান্না সারিয়া, দশটার মধ্যে খাওয়া দাওয়া করিয়া, লিলিবিশ্বাসের বাড়ী বেড়াইতে গেলাম দেখি, তিনি বাহিরের ঘরে বসিয়া বাঙ্গলা সংবাদ পত্র পড়িতেছেন।

আমি যাইতেই, আদর করিয়া, নিজের কাছে একটী চেয়ারে আমাকে বসাইলেন। তারপর বলিলেন, "দেখ প্রমীলা, সকলেরই সংবাদ-পত্র পড়া উচিৎ। যে দেশ যত উন্নত, সে দেশের মধ্যে সংবাদ পত্রের প্রচার তত বেশী। সংবাদ পত্র পড়লে খবরের সঙ্গে সঙ্গে নানা বিষয়ে আমাদের জ্ঞান লাভ হয়।"

আমি তাঁহার কাছ হইতে সংবাদ পত্রের একখানি পাতা লইয়া পড়িতে লাগিলাম। পড়িতে পড়িতে একটী সংবাদে আমার দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইল।

বিবিধ সংবাদের মধ্যে এক জায়গায় লেখা আছে ; —"আমরা খুব আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, বাগবাজারে অবস্থিত 'সনাতন বিধবাশ্রম' দিনের পর দিন ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও তত্ত্বাবধায়ক সুযোগ্য তোতারাম চার বৎসর পূর্ব্বে, পাঁচটী হিন্দু বিধবা লইয়া, সাধারণের মুষ্টিভিক্ষা ও চাঁদার উপর নির্ভর করিয়া এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্ত্তমানে আশ্রমবাসিনীর সংখ্যা প্রায় শতাধিক। যে সকল বিধবা এই আশ্রমে আসেন, তাঁহাদিগকে লেখাপড়ার সহিত স্বাবলম্বন ও বিবিধ শিল্পকার্য্য শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং যাঁহাদের পুনরায় বিবাহ করিবার ইচ্ছা থাকে, তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে দেখিয়া শুনিয়া উপযুক্ত পাত্রের হস্তে সমর্পণ করা হয়। মারওয়ারী সম্প্রদায় হইতেই এই আশ্রমের জন্য অধিকাংশ সাহায্য অসিয়া থাকে। আমরা সহৃদয় বাঙ্গালী ধনীদেরও ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সানুনয় অনুরোধ করিতেছি।

সাধারণ যে কোনো হিন্দু আশ্রয়হীনা বিধবা, এই আশ্রমে সংবাদ দিলে, আশ্রম তাঁহাকে যাথাসাধ্য সাহায্য করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।"

এই সংবাদটী লিলি বিশ্বাসকে দেখাইয়া আমি বলিলাম, "আপনি অনুগ্রহ করে এই আশ্রমে আমি যাতে থাকতে পারি, তার বন্দোবস্ত ক'রে দিন। দেখুন, আমি তো সত্যি সত্যিই অনাথা বিধবা! সুতরাং আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই আমাকে আশ্রয় দেবেন।"

তিনি বলিলেন, "দেখ ভাই, কোনো জিনিষ বাহির থেকে দেখে, তার ভিতরের স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না। যাকে আমরা ভাল বলে জানি, হয়ত ঠিক সেটী মন্দ। ব্যবহারে আনি, তখন দেখি

আমাদের পূর্ব্ব ধারণা সমস্তই উল্টো ও ভুল। অবিশ্যি এ-সব আমি আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি।"

আমি অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রকম দিদি?"

তিনি বলিলেন, "শুনবে? এতদিন আমি কারুকে এই অভিশপ্ত জীবনের দুঃখের কথা বলিনি। আর বলবার মত তেমন লোকও কখনো পাই নি। এখন বুঝছি তুমি আমারই মত একজন, এবং আমার দরদী। বোধ হয় তোমরা দেখে থাকবে, পাদরী সাহেবরা সুসমাচার প্রচার ক'রে, অনেক নর-নারীকে অন্ধকার থেকে আলোকে আনয়ন করেন! এই আলোকে যাতে লোকে পৌঁছিতে পারে, সে জন্যে তাঁদের অনেক রকম ফিকির খাটাতে হয়। যখন তাঁরা দল বেঁধে সুসমাচার প্রচার করতে বাহির হন, তখন খৃষ্টধর্ম্ম যে সকল ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই কথাটাই নানা প্রকারে সর্ব্বসাধারণের কাছে জাহির করেন! অন্যান্য ধর্ম্ম, ধর্ম্মই নয়, সে কথা প্রমাণ করতে সময় সময় তাঁদের অনেক কিছুই করতে হয়। এমন কি যার যে দিকে ঝোঁক বেশী, অর্থাৎ যে যা চায়, তাকে 'তাই দেব ব'লে প্রলোভন দেখিয়ে পাদরীরা নিজের দলে সকলকে টেনে নেন্।"

আমি বলিলাম, "সে আবার কি?"

তিনি বলিলেন, "মনে কর, যারা ধর্ম্মের পাগল, তাদের ধর্ম্ম দিয়ে, অন্ধকার হতে আলোকে আনেন। যারা চাকরী চায়, তাদের চাকরী দেবার লোভ দেখান। যে-সব পুরুষ বিবাহ করতে চায়,—সুন্দরী মেমের সঙ্গে অথবা সুন্দরী বাঙ্গালী বা অন্য কোনো দেশের সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়ার লোভ দেখান। আবার যে নারী সংসারে কষ্ট পায়,

তাকে সুখ দিবারও প্রতিশ্রুতি দেন! কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রতি-শ্রুতি কতখানি রক্ষিত হয়, সেটাবলা কঠিন। অনেকে কিল খেয়ে কিল হজমকরেন, আবার, অনেকে অনুতাপও করেন। এ-সব আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি।"

আমি বলিলাম, "পাদরী সাহেবরা তো শুনেছি নানাভাবে লোকের উপকারই করে থাকেন। জায়গায়—জায়গায় কত বিদ্যালয় তাঁরা স্থাপন করেছেন, তাতে সাধারণের কত উপকার হচ্ছে বলুন ত?"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, এ কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। জানোইতো ভাই, আলোকের নীচেও অন্ধকার থাকে! কিন্তু এ সবের মধ্যেও যে গোপন উদ্দেশ্য আছে, সেটাও অস্বীকার করলে চ'লবে না। কিন্তু সে-কথা এখন থাক্। আমার নিজের ইতিহাসটুকু সংক্ষেপে বলি! আমার মা বিধবা হয়ে, পেটের জন্যে ভাসুরের কাছে গাধার মত খেটেও যখন তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারলেন না, তখন তাঁর মন ভাসুরের সংসারের উপর বিতৃষ্ণা হয়ে প'ড়েছিল। মাঝে মাঝে যখন তার উপর নানাপ্রকার অত্যাচার হতো, তখন তিনি এমনি বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন যে, ভাবে বোধ হ'তো হয়ত এখনি এইদণ্ডে এ-সংসার ছেড়ে চ'লে যাবেন।

অদৃষ্টের ফেরে, একদিন এইরকম তাঁর মনের অবস্থা হ'লে কোত্থেকে এক গেরো এসে উপস্থিত হ'ল, যার জন্যে মাকে আমার চিরদিন অনুতাপ করতে হয়েছিল।

—"আমাদের গ্রামে দু'টী খৃষ্টান মহিলা, মাঝে মাঝে 'সুসমাচার' প্রচার করতে আসতেন। বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়ে, মেয়েদের সঙ্গে

আলাপ পরিচয়ও করতেন। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের নিয়ে হাসি-গল্প করতেন, আদর করতেন। ভালো ভালো ছবি বিতরণ করতেন। আবার সময় বুঝে, সংসারে প্রপীড়িতা মেয়েদের সহানুভূতি দিতেও কসুর করতেন না। আমার মায়ের উপরও তাঁদের দৃষ্টি পড়লো। বাড়ীর লোকেদের অত্যাচারে মা তখন মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তিনি তাঁদের কথাবার্ত্তায় ক্রমেই আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। গোপনে দু'পক্ষে পরামর্শ চ'লতে লাগলো। তাঁরা মাকে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁদের আশ্রমে গেলে খাওয়াপরার কোনো কষ্টই থাকবে না। তাছাড়া কন্যার অর্থাৎ আমার, উচ্চ শিক্ষারও ব্যবস্থা হবে। আমরা জাতিতে সৎগোপ ছিলাম। আমার মায়ের এমন কোনো শিক্ষা হয় নি, যাতে ভবিষ্যতটা তিনি বেশ তলিয়ে বুঝতে পারেন। কাজেই একদিন তিনি রাত্রে আমাকে নিয়ে ভাসুরের সংসার ত্যাগ ক'রে, সহরে খৃষ্টানদের আশ্রমে এসে আশ্রয় নিলেন।

—"মা বাড়ীর বাহিরে পা দিতে না দিতেই গ্রামে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল যে, আমরা খৃষ্টান হ'য়ে গেছি! শুনেছিলাম এর জন্যে আমার জ্যাঠা-মশায়কে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গ্রাম্য সমাজকে কিছু অর্থ দণ্ডও দিতে হয়েছিল। আমার বয়স তখন সাত-আট বৎসর। কাজেই তখনকার ঘটনা আমার বেশ মনে আছে।

—"দু'এক মাস যেতে না যেতে, মা নিজের ভুল বেশ বুঝতে পারলেন, কিন্তু তখন আর সে ভুল শোধরাবার উপায় নাই। শোধরানর যারা মালিক, সেই হিন্দুসমাজই যখন চক্ষু বুজে ধ্যানে মগ্ন আছে, তখন আমার মা'র মত নিরাশ্রয় মূর্খ স্ত্রীলোকে কতটুকু কি করতে পারে?

তিনি ঘরে ফেরবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু ফিরবার আর উপায় ছিল না তখন। তাছাড়া খৃষ্টান সমাজে লেখাপড়া না জানলে কষ্টের একশেষ হয়। নীচেরও অধম হ'য়ে বাস করতে হয়, তবু দুঃখ ঘোচে না। আমার মাও ছিলেন পাড়াগেঁয়ে—চাষার ঘরের মূর্খ মেয়েমানুষ। লেখাপড়ার সঙ্গে কোনো সম্বন্ধই তাঁর ছিল না। কাজেই তাঁর কষ্টও হয়েছিল যথেষ্ট!

অনেকগুলি অনাথ শিশু এখানে প্রতিপালিত হতো। তাদের মধ্যে কতকগুলির মা বাপ বা অন্য কোনও অভিভাবক না থাকায় এখানে এসেছে। আর কতকগুলি নষ্ট চরিত্রের স্ত্রীলোক, নিজেদের সন্তান পাদরীদের হাতে সঁপে দিয়ে পাপের স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছে। এ কথা না বললে সত্যের অপলাপ করা হবে যে,—পাদরীরা আন্তরিক যত্ন নিয়েই এই সব অনাথ বালক বালিকাদের লালন-পালন করতো। ভিতরে যাই থাক্, বিচার করে দেখতে গেলে বেশ বোঝা যাবে—এই পাদরীরা দেশের মধ্যে স্কুল কলেজ, অনাথ-আশ্রম প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে দেশবাসীর যা উপকার করেন, তা ব্যাপকভাবে হিন্দু বা মুসলমান সমাজেরও করা উচিত ছিল।

—"আশ্রমের মধ্যে ব'সে ব'সে খাওয়ার নিয়ম নেই। যে যেমন তাকে তেমনি ভাবের কাজ করতে হয়। যারা ছাত্র-ছাত্রী তারা লেখাপড়া করবে, এবং সময় মত আশ্রমের সাহায্যও করবে। আর যারা প্রাপ্তবয়স্ক তাদের হাতে এক-একটা কাজের ভার দেওয়া আছে। আমার মা ছিলেন পাড়াগেঁয়ে মূর্খ মেয়েমানুষ, তাঁর দ্বারা অন্য কাজ হওয়ার তেমন সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই মা'র উপর কতক-

গুলি ছেলেমেয়ের ভার পড়লো। তাঁর কাজে সামান্য একটু ত্রুটী হলে যথেষ্ট ভৎ'সনা সহ্য করতে হতো। মা আমার সময় সময় আক্ষেপ ক'রে বলতেন, আগে যদি জানতাম যে আমাকে এত কষ্ট ক'রে ময়লা-মাটী ঘেঁটে, গা'ল মন্দ খেয়ে, বিজাতির ভাত খেতে হবে, তা হ'লে কখনো জাতের অন্ন ফেলে আসি? লাঞ্ছনা-গঞ্জনা যতই পাই, সে আমার আপন লোকের কাছে। এর চেয়ে আমার সেখানকার ভাত খাওয়া ঢের ভাল ছিল!'

—"মাকে বেশী দিন এ রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় নি। অতিরিক্ত পরিশ্রমে অল্প আহারে ও মানসিক কষ্টে শীঘ্র তিনি দেহ ত্যাগ করলেন। জগতে আপন বলতে আমার যে বন্ধন ছিল তা কেটে গেল! তখন থেকে আমি এক ঘেয়ে জীবন কাটাতে লাগলাম। সকালে উঠে ঘড়ির কাঁটার মত লেখাপড়া করতাম, খেতাম, আশ্রমের মধ্যেই ইস্কুলে যেতাম, বিকেলে বাগানে কাজ কর্ম্ম করতাম, রাত্রে পড়াশুনা করে, খাওয়ার পর শুয়ে পড়তাম। দুই বেলায় দু'মুঠো ভাত! জলখাবার ব'লে বড় একটা কিছু জানতাম না। প্রত্যহ একই রকম ব্যবস্থা—ভাত, ডাল, তরকারী। সময় সময় মাছ বা মাংসও হ'ত। নিজের কাপড় জামা নিজেকেই সাবান দিয়ে পরিষ্কার করতে হত। তাছাড়া পালা ক'রে আশ্রমের অনেক কাজও করতে হত। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে কোন কোনও মেয়ের বিয়েও হ'ত। খৃষ্টান-সমাজে যে স্ত্রীলোকের বিবাহ হয়, তাকে বড়ই সৌভাগ্যবতী বলতে হবে। কারণ এ-সমাজে স্ত্রীলোকের সংখ্যা বড্ড বেশী। একে স্ত্রীলোক বেশী তার উপর স্ত্রী পুরুষদের মধ্যে অবাধ মেলা মেশাও আছে। কাজেই অনেক যুবক চরিত্র নষ্ট ক'রে ফেলে।

বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকই নীচ জাতির সমাজ থেকে সংগ্রহ হয় বলে, তাদের মনোবৃত্তিও বড়ই নীচ হয় এবং আপন চরিত্র সম্বন্ধেও তারা সতর্ক থাকতে শেখে না।

আমি বলিলাম, "আপনি নিজে খৃষ্টান মহিলা হ'য়ে এ সব কথা বলছেন, কেন ?"

তিনি বলিলেন, "যা সত্য, তাই বলছি। এ আমার নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তারপর শোনো,—আমি যখন যৌবনে পা দিলাম, তখন আমাকেও পাপের পথে পা দিতে হলো। ভাল শিক্ষা পাব কোথা হতে ? আশ্রমের বাইরে যাওয়ার তো তেমন স্বাধীনতা ছিল না। কাজেই শিক্ষা-দীক্ষা, আচার ব্যবহার সবই ছিল সীমাবদ্ধ।

যখন দেখলাম এদের মধ্যে বেশীর ভাগই এই দিকে, তখন আমিও সহজে বুঝে নিলাম—এ সব করা হয়তো কোন দোষের নয় কিম্বা এই-ই হয়তো নিয়ম। কিছু দিন পরে আমিও একটী নাগর সংগ্রহ করলাম। তিনি অন্যান্য নাগরের ন্যায় মাঝে মাঝে বাগানের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে রাত্রে আমার কুঞ্জে এসে দেখা দিতেন। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, এই লুকোচুরিতে আমাদের দুইজনের মন হাঁপিয়ে উঠলো। আমরা পরামর্শ ক'রে একদিন রাত্রে আশ্রম হতে পালিয়ে, সহরে ঘর ভাড়া নিয়ে, স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে লাগলাম। মাসখানেক পরে একদিন দুইজন শিক্ষয়িত্রী গিয়ে, আমাকে পুনরায় আশ্রমের জেলখানায় এনে পূরে ফেললে। দিন কতক বেশ ভাল ভাবে থাকলাম, কিন্তু এরূপ আবহাওয়ার মধ্যে থেকে যৌবনের উত্তেজনা দমন করা বড়ই কষ্টকর। বিশেষতঃ আমার মত নারীর পক্ষে, কেন না একবার আমার পা পিছলে গেছলো, পাপের

আস্বাদনও আমার অজানা ছিল না! একদিন গির্জ্জায় গিয়া আমার সেই নাগরটীকে ইসারা জানালাম, তিনিও সেই রাত্রে আমার কুঞ্জে গিয়ে হাজির হলেন। দুজনে পরামর্শ ক'রে ঠিক হল, আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকব। নাগরটি হারমোনিয়ামের দোকানে কাজ করতেন। তিনি কলকাতায় এক হারমোনিয়ামের দোকানে কাজ ঠিক ক'রে আমাকে নিয়ে এলেন। আমরা দু'জনে সেখানে নূতন সংসার পাতলাম। শিল্পীদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই একটা না একটা নেশাতে বশীভূত হয়। আমার প্রাণনাথও মদ খেয়ে এসে, আমার সঙ্গে এমনভাবে প্রেমালাপ করতো যে, সময় সময় আমার প্রাণ অস্থির হয়ে উঠ্‌তো। অল্প আয়, তাতে কলকাতা সহর, এর উপর যদি নেশাতে পয়সা খরচ হয়, তবে সংসারের কি অবস্থা হতে পারে সেটা বেশ বুঝতে পারছ! তবু এত অভাব ও অসুবিধার মধ্যে থেকেও কোন প্রকারে যৌবনের উদ্দাম নেশাতে বিভোর হ'য়ে চোখ-কাণ বুজে দিন কাটাচ্ছিলাম। কিন্তু এ সুখও বেশী দিন আমাকে ভোগ করতে হল না। প্রাণনাথ শীঘ্রই

পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটী শিক্ষয়িত্রীকে বিবাহ ক'রে আমার প্রতি তাঁর প্রগাঢ় প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখালেন। সে এইবার আমাকে বাধ্য হয়ে নিজের পথ দেখতে হল। আমি অনেক চেষ্টা করে এক দয়াবতী মেয়ে ডাক্তারের বাড়ীর গৃহস্থালীর কাজে ভর্ত্তি হই। সেই মহিলাটীর একবার কঠিন ব্যারাম হয়। আমি সে সময় প্রাণান্ত পরিশ্রম করে—তাঁর সর্ব্ব প্রকার সেবা-শুশ্রূষা করেছিলাম। তিনি নীরোগ হয়ে, আমাকে গৃহস্থালী কাজের পরিবর্ত্তে, নিজের সহকারী ক'রে নিলেন এবং আমার প্রতি খুব সদয় ব্যবহার করতে লাগলেন। তাঁরই

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

আন্তরিক চেষ্টায় আমি ক্রমে ধাত্রীবিদ্যা শিখিলাম, এক্‌জামিন দিয়ে পাসও করলাম। তাঁর পর তিনি চেষ্টা ক'রে আমাকে "কল" জোগাড় ক'রে দিতে লাগলেন। তার পর তাঁর মৃত্যুর পর আমি এখানে এসে স্বাধীন ভাবে কাজ করছি।' কি জন্য জানি না, তিনি বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং পুরুষের উপর তাঁর বড়ই ঘৃণা ছিল। মৃত্যুর পর তিনি তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি "অনাথ আশ্রমে" দান করে গেছেন! সত্যি কথা বলতে কি ভাই, তাঁর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমারও মন কতকটা তাঁরই মত গ'ড়ে উঠেছে। আমার পশার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন, এখনও চাইছেন, কিন্তু ন্যাড়া দু'বার করে বেলতলায় যায় না। আমি আর কিছুতেই বন্ধনের মধ্যে যাচ্ছি না। যে কয়দিন বাঁচব, এই ভাবেই কাটিয়ে দিয়ে যাব।

—"আমার আপন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই তোমাকে বলছিলাম —আগে ভাল করে কোন জিনিষ না জেনে, তাতে হাত দিতে নাই। দেখ সংবাদ পত্রে এমনি অনেক প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি ও নিন্দা দুই-ই শুনতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ বণিক জাতির উপর আমার কোনো কালেই বিশ্বাস নাই। তারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ভিন্ন কোন কাজে হাত দেয় না। তাহাদের দান-খয়রাতের মধ্যে বুঝবে নিশ্চয়ই অন্য কোনও মতলব আছে।

যাক্‌ গে ভাই, অনেক বক্‌লাম, আর বেশী কিছু তোমাকে বলবো না, তবে একটা কথা বলি,—খবরের কাগজ প'ড়ে তুমি যে আশ্রমের কথা বলছিলে, যদি এই আশ্রমেই তুমি যেতে চাও, আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু যাবার পূর্ব্বে একবার ভাল ক'রে সংবাদ নেওয়া উচিৎ।

আমার সেখানে যাইবার প্রবল ইচ্ছা আছে জানিয়া, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই 'সনাতন-বিধবাশ্রমের' ম্যানেজারের নিকট আমার জন্য অনুরোধ করিয়া দরখাস্ত পাঠাইলেন।

পরদিন বেলা আটটার সময়, লিলি বিশ্বাস তাঁর বাড়ীতে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আমি বাহিরের ঘরে ঢুকিয়া দেখি, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী বাঁধিয়া এক প্রৌঢ় ব্যক্তি লিলি বিশ্বাসের সামনে চেয়ারে বসিয়া, হাত মুখ নাড়িয়া বক্তৃতা করিতেছেন।

তিনি আমাকে দুই চারিটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

বুঝিলাম, আমার দুঃখে তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে আশ্রমে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ভাবিলাম, বামুনদিদির সহিত দেখা করিয়া, তবে যাওয়া উচিৎ। সেই জন্য তাঁহাকে জানাইলাম—"আগামী কল্য আশ্রমে যাইব।"

তখন তিনি পকেট হইতে একটা ফর্ম্ম বাহির করিলেন; আমি তাহা পূরণ করিয়া দিলাম। লিলি বিশ্বাস তাহাতে সাক্ষী হইলেন।

১৯

জীবনে আর একটা বিপদ দমকা ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। পরদিন সকালে সজল নেত্রে বামুনদিদি ও বাড়ীর অন্য সকলের নিকট এবং মিস্ লিলি বিশ্বাসের নিকট বিদায় লইয়া, গতদিনের পরিচিত সেই ম্যানেজারবাবুটীর সহিত সনাতন বিধবাশ্রমে আসিয়া হাজির হইলাম।

বাড়ীটী প্রকাণ্ড, দরজায় লাঠি সোটা ধারী দরওয়ান। বাড়ী হইতে কাহারও কোনও প্রকারে বাহিরে যাইবার উপায় নাই! ভিতরে গিয়া দেখি সমস্ত আশ্রমবাসিনী আমারই ন্যায় যুবতী। শুনিলাম, ইঁহারা যুবতী ছাড়া প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাকে আশ্রমে ভর্ত্তি করেন না। আমি ভিতরে যাইতেই আমারই সমবয়স্কা একটী যুবতী কাছে আসিয়া, আমার হাত ধরিয়া বলিল, "এস ভাই তোমার বুঝি কোন জিনিষ পত্র নেই? আর জিনিষেরই বা কি দরকার? থান'চারেক কাপড়, একখানা গামছা, আর এক প্রস্থ বিছানা তো, তা আশ্রমেই যথেষ্ট মজুত আছে।

এমনি সময় আশ্রমের একটী ঝি আসিয়া বলিল, "মনিদি, ম্যানেজার-বাবু বল্লেন, এই নতুন দিদি উপস্থিত আপনার ঘরে থাকবেন। ওনার কাপড় চোপড় যা দরকার, আপনার ঘরেই রেখে আসব। উনি নতুন লোক, এখানকার হাল চাল জানেন না, দেখবেন যেন কোনো কষ্ট না হয়। আর আপনি ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে আসুন। জরুরী তলব।"

"আচ্ছা", বলিয়া মনিদি আমার হাত ধরিয়া দ্বিতলে নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে ঢুকিল। এই ঘরটী বাড়ীর পিছনে হইলেও, একটি গলি রাস্তা থাকায়, বেশ আলো বাতাস ছিল!

সে আমার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নামটি কি ভাই ?"

"প্রমীলা।"

"বাঃ বেশ মিলে গেছে, প্রমীলা আর মনিমালা! আচ্ছা প্রমীলাদি, তোমার বাড়ী কোথায় ছিল ?"

"গ্রামের নাম আর করব না ভাই, তবে জেলা নদীয়া। জাতিতে কায়স্থ।"

"বাহবা! একেবারে সব মিলে যাচ্ছে যে। নদীয়া জেলায় আমারও বাড়ী। আমরাও জাতীতে কায়স্থ। দেখে বোধ হচ্ছে তুমি বিধবা, আমিও তাই! ভগবান আমাদের বেশ মিলিয়ে দিয়েছেন, তবে একসঙ্গে বেশী দিন থাকা হবে কি না সন্দেহ।"

"কেন ?"

"সে ভাই অনেক কথা, সময় মত বলব এখন। যে ক'দিন বেশী থাকতে পারি, তার চেষ্টা ক'রে তো দেখি। তারপর যা হয় হবে। তুমি ততক্ষণ চুলটা খুলে তেল মাখ। আমি ছুটে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

মণিদি ঝড়ের মত ছুটীয়া চলিয়া গেল। আমি তার কথা মত জানলার কাছে দাঁড়াইয়া চুলটা খুলিতে লাগিলাম, আর যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, কলিকাতার সারি বন্দী সাজানো বাড়ীগুলির পানে হাঁ করিয়া চাহিতে লাগিলাম। ঠিক জানলার সামনে, গলির

উপরে একতলা একখানি বাড়ীর ছাদে ছোট একটী বৌ, এক বিঘৎ ঘোমটা টানিয়া ছাদের উপর ভিজা কাপড় শুকাইতে দিতেছিল। তাহার প্রতি নজর পড়ায় মনের মধ্যে ভাবের বন্যা আসিয়া পড়িল। হায়রে! একদিন আমিও এমনি বধূ ছিলাম, আমারও সব ছিল।

অদৃষ্টে নাই, কি করিব! নতুবা আমিও ওদেরই মধ্যে একজন হইতে পারিতাম!

•

মণিমালা হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিল, "প্রমীলাদি, আমি যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই! তোমার উপর বুড়োর নজর পড়েছে, অন্ততঃ তোমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী না আসা পর্য্যন্ত উপস্থিত তোমাকে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ঢিলে পাজমার দেশে গিয়ে ডাল-রুটী বানাতেও হবে না, খেতেও হবে না। দেখছি এখন আমাকেই কোনো পাঞ্জাবী প্রাণ-বল্লভের সঙ্গে ডাল-রুটী খেতে সেই দেশে রওনা হ'তে হবে।

আমি তাহার হেঁয়ালির কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া বলিলাম, "মণিদি, ব্যাপারটা খুলে বল দেখি, ভাই।"

—"সে অনেক কথা ভাই। এই যে বিধবা আশ্রম দেখছ, এটী হচ্ছে পাঞ্জাব ও সিন্ধু দেশে যুবতী স্ত্রী চালান দেবার মস্তবড় এক আড়ৎ।

—"সেখানে মেয়ে চালান দেয় কেন?"

"সেখানে সাধারণতঃ মেয়েদের সংখ্যা কম। অনেক পুরুষের বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত পাত্রীর অভাবে বিবাহ হয় না। অনেকে পাত্রী সংগ্রহের জন্য অনেক টাকা খরচ করে। অন্য দেশ হতে মেয়ে নিয়ে যাওয়া

বড় একটা সুবিধা হয় না। কাজেই বেওয়ারিশ বাংলা দেশ হ'তে তারা মেয়ে আমদানি করে। এই মেয়ে নানা রকমে সংগ্রহ হয়। সাধারণের ও পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে, রীতিমত এ একটা ব্যবসা সুরু হয়েছে। অনাথা বিধবাদের আশ্রম ব'লে দেশের বহু ধনী ও বড় বড় লোক সাধ্য মত এখানে সাহায্য পাঠান, অনেক নামজাদা লোক এই আশ্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্টও আছেন, কিন্তু তারা তো জানেন না, যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এখানকার যমরাজ তুল্য পরাক্রমশালী ম্যানেজার বাহাদুর লুকিয়ে লুকিয়ে কি কাণ্ড করেন। সাধারণের দোষ দিই না, কর্ত্তৃপক্ষেরও দোষ নেই। যে কোনো কাজই বলো পাঁচজনের দ্বারা পরিচালিত হ'লেও, একজনকে তার তদারকের ভার দিতে হয়, কিন্তু তদারক করতে ব'সে, সেই লোক যদি রক্ষক হ'য়ে ভক্ষকের পেশা সুরু করেন, তাহ'লে পাচজনে করবে কি! কে সাহস ক'রে পাঁচজনকে জানাবে?"

আমি অবাক হইয়া গেলাম। আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত বিস্ময়ে ও ভয়ে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। হা ভগবান! বিপাকে পড়িয়া সাগরে তৃণ খণ্ড আশ্রয়ের মত যেখানে যাইতেছি, সেই খানেই এই সব ব্যাপার এই অশ্লীলতার বিরাট কারবার! এ যে আর সহ্য করা চলে না! সৎপথে থাকিব বলিলেও যে থাকিবার উপায় নাই আমার!

মণিদিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আশ্রম থেকে ম্যানেজারবাবু তাহ'লে টাকা ঘুষ নিয়ে মেয়েদের বিবাহ দিবার ছলে যেখানে সেখানে চালান ক'রে দেন? আচ্ছা, কি রকম ভাবে টাকা তিনি আদায় করেন? তুমি জানো!

জিনিষ হিসাবে দর হয়। ষোড়শী যুবতী হলে দর বেশী যত ছোট বা বয়স বেশী হবে দর তত কম হবে। দেখ্‌তে শুনতে ভাল বা রং ফর্সা হলেই দামের মাত্রাটা বেড়ে যায়। সাধারণতঃ চৌদ্দ হতে কুড়ি বৎসরের মেয়েদের দামই সব চেয়ে বেশী। তার চেয়ে বয়স কম বেশী হলে দরেরও ইতর বিশেষ হয়। দেখেছি সময় সময় সুন্দরী মেয়েরা খুব বেশী রকম চড়া দরে বিক্রী হয়েছে। আমাকে দেখে এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক দু'হাজার দর দিয়েছিল, কিন্তু তখন ম্যানেজারের শয্যার অংশভাগিনী ছিলাম ব'লে, দয়া করে তিনি ছাড়লেন না। এখন বুঝছি, তোমাকে হাত করতে পারলে, আমাকে তিনি অনায়াসেই ছেড়ে দেবেন। আবার তুমি যখন নিলামে চড়বে, তখন আমার চেয়েও তোমার ডাক বেশী উঠবে! তোমার মত সুন্দরী মেয়ে এ আশ্রমে এ পর্য্যন্ত আসে নি। সেই জন্যেইত তোমাকে দেখে বুড়ো মিন্‌সের মুখ দিয়ে লালা ঝরচে।"

ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া পড়িল। গলা শুকাইয়া কাট হইল। ভয়ে ভয়েই শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "ব্যাপার কি মণিদি? সমস্ত খুলে বল ভাই, আমার যে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপছে।"

"কাঁপবে কেন? ভয় কি? যখনকার যা তখনকার তা!...ব্যাপার জানতে চাইছ? কিন্তু ব্যাপার ত বোন্ অতি সোজা। এইটুকু যদি বুঝতে না পার, তবে গোড়া হতে অবশ্য আবার রামায়ণ সুরু করতে হয়। এই আমার কথাই ধরোনা আমার ত সবই ছিল; কিন্তু নিজের বুদ্ধির দোষে সব হারিয়ে ব'সে আছি। আমার অল্প বয়সে বিয়ে হয়, এবং কয়েক মাস পরেই বিধবা হই। সেই বিয়ের সময় ছাড়া

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

শ্বশুর বাড়ীর চেহারা আর কখনও আমি দেখিনি। স্বামী যে কি জিনিষ তা-ও কিছুই জানি না! মা আমাকে বরাবর কুমারীর মত রেখে ছিলেন। আমি যাতে পড়া-শুনো নিয়ে আনমনা থাকি। সেই জন্য ভাল ক'রে আমাকে লেখা-পড়াও তিনি শিখিয়েছিলেন। বাড়ীর মেয়ে, ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি; কাজেই দাদাদের যে সব বন্ধুরা আমাদের বাড়ী আসতেন, তাদের সঙ্গে আমিও অবাধে মেলা মেশা করতাম। এরজন্যে বাড়ীর কেউ কোনদিন আপত্তি করতো না, বা কোন সন্দেহও করতো না। যৌবন কালের খেয়াল, এ-সময় সকলের সহিষ্ণুতা সমান থাকে না। কি ক'রে জানিনা, দাদার এক বন্ধুর প্রতি আমার মন পড়ে' গেল। কিছুদিন থেকে আজকালকার তরুণ লেখকদের লেখা উপন্যাস পড়তে আরম্ভ করেছিলাম। তখন তো জানতে পারিনি যে এইসব কু-রুচি পূর্ণ উপন্যাস পড়ার কুফল একদিন না একদিন আমাকে ভোগ করতে হবে। ক্রমে ক্রমে ভালোবাসা লোকটিকে লুকিয়ে লুকিয়ে চিঠিপত্র দিতে আরম্ভ করলাম। চিঠি পত্র আদান প্রদানের ফলে দু'জনের মধ্যেই প্রচুর উৎসাহ এলো। মিলনের জন্যে দু'জনেই পাগল হ'য়ে উঠলাম...আমাদের মিলন হ'ত লুকিয়ে। কখনো ছাদে, কখনো বাগানে, কখনো বা মাষ্টারের ঘরে! ছোট ভাইদের পড়াবার জন্যে বাবা একটী মাষ্টার রেখেছিলেন। তিনি বাড়ীর বাহিরের ঘরে থাকতেন। বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে কেউ কোনো দিন সে দিক দিয়ে যাওয়া আসা করতো না। মাষ্টারের সেই ঘরটিই ছিল আমাদের সব চেয়ে সেরা মিলন ক্ষেত্র।

আমরা দু'দিক থেকে দু'জনে ওৎপেতে থাকতাম, কখন মাষ্টারমশাই

বাইরে যান ! একদিন মাষ্টারমশাই বেরিয়ে গিয়ে, আবার কি কাজের জন্যে হঠাৎ ফিরে এলেন ! আমরা তখন বিলাস-কুঞ্জে—প্রেমালাপ স্থরু করেছি ! মাষ্টার প্রত্যহ যেমন যান তেমনি গেছেন। এত তাড়াতাড়ি যে তিনি ফিরে আসবেন, সে আশা করিনি ! তাঁর চোখের সামনে, তাঁরই ঘরের মধ্যে আমরা হাতে-নাতে ধরা প'ড়ে গেলাম। আমার আপনজন দাদার—সেই বন্ধুটী "য পলায়তি স জীবতি" পন্থানু সরণ করলেন ! আর আমি তো পুরুষ নই, আমার সাতখুন মাপও নয় ! কাজে কাজেই আমি বেকুবের মত মাথা হেঁট করে সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাক্‌লাম তারপর তাঁর পা ধরে কাঁদতে লাগলাম, আর মিনতি করতে লাগলাম যে, একথা, যেন তিনি কদাচ কারো কাছে প্রকাশ না করেন। তিনি অনেক বক্তৃতা ক'রে স্বীকার করলেন যে, একথা কারো কাছে প্রকাশ করবেন না। সর্ত্ত রহিল আমি যেন ভবিষ্যতে ঐ বদমায়েসটির সঙ্গে কিছুমাত্র সংস্রব আর না রাখি। যদি মাষ্টার মশায় কখন দেখেন বা শুনিতে পান যে, আমি সেই লম্পটের সঙ্গে পুনরায় মিশেছি, তা হলে তৎ-ক্ষণাৎ সমস্ত কথাই তিনি বাবাকে বলে দিতে বাধ্য হবেন। যেহেতু তিনি আমার বাবার নিকট উপকৃত ! এই সর্ত্তে তিনি তখনকার মত আমাকে রেহাই দিলেন বটে, কিন্তু তারপর দিন থেকে আমাকে সেই পাজী বদ্‌মায়েসের শিরোমণি মাষ্টার মশায়টি দিব্য স্থায়ী ভাবে অধিকার ক'রে বস্‌লেন। আমি ভয়ে বাধ্য হয়ে, তাঁর দাসী হয়ে পড়লাম, আস্তে আস্তে তাঁর অত্যাচার এতই বাড়া বাড়ি হ'তে আরম্ভ হ'ল যে, বাধ্য হ'য়ে অর্দ্ধরাত্রে আমাকে বিছানা হতে উঠে এসে তাঁর ঘরে তাঁর শর্য্যাসঙ্গিনী হ'তে হতো, একদিন ধরা পড়ে গেলাম। ফলে মাষ্টার বিদায় হলেন, কিন্তু

যাবার সময় তিনি রেখে গেলেন তার স্মৃতি চিহ্ন আমার গর্ভে! অবশ্য এটা আমি তিন চার মাস পরে বুঝতে পারলাম। উপায়? বাবার এতবড় সম্মান, ধূলোয় মিশিয়ে দেব। আর বাড়ীতেই বা কি ক'রে মুখ দেখাব? অনেক ভেবে চিন্তে আমার প্রথম নাগর সেই দাদার বন্ধুটীকে স্মরণ করলাম। দু'জনে গোপন পরামর্শ করে, কলকাতা আসাই ঠিক হল। আমি তার উপদেশ মত আমার সমস্ত গহনা পত্র সংগ্রহ করে একদিন রাত্রে, তার সঙ্গে অকূল সাগরে ভেসে পড়লাম।

—"কলকাতায় এসে, সামান্য ভাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে আমরা দু'জনে স্বামী-স্ত্রী ভাবে বাস করতে লাগলাম! এর মধ্যে অনেক টাকা খরচা করে অনেক তদ্বিরের পর কী কষ্টে যে গর্ভস্থ সেই নিষ্পাপ শিশুটিকে নষ্ট করে ফেলেছিলাম তা আমার অন্তর্যামী ভিন্ন অন্যে কেউ বুঝবে না! পাপের পথে পা দিয়ে নারী এতবড় রাক্ষসীও হ'তে পারে! কলকাতায় কতকগুলি লোক আছে, যাদের পেশা হ'লো ঐ ভ্রূণ হত্যা করা। তাদের যারা চায়, তারাই খালি জানতে পারে। যারা এই পথের পথিক, তারা পুলিশের চোখে ধূলি দিয়ে নিজেদের কাজ হাঁসিল করে। এরা কিন্তু সহজে ধরা পড়ে না। কারণ যারাই এই শ্রেণীর লোকদের সাহায্য নেয় লোক লজ্জা বা পুলিশের ভয়ে কখনই তারা এদের নাম প্রকাশ করতে পারে না। একেত অবৈধ উপায়ে গর্ভ হয়েছে, কলঙ্কের কথা! তারপর এ কথা প্রকাশ হলে নিন্দা ও আইন দুই আছে। কাজেই এই সকল ভয়ানক লোক সমাজের মধ্যে থেকেও,

আইনকে ফাঁকি দিয়ে দশজনের মধ্যে সমান স্পর্দ্ধায় বুক ফুলিয়ে বেড়ায়!

—"আমাদের আয় নেই, ব্যয় আছে! কাজেই মাস কয়েকের মধ্যেই আমার সমস্ত গহনা বিক্রী হ'য়ে গেল। ওদিকে দুর্গমের সাথী দাদার সেই বন্ধুটিও গতানুগতিক পন্থা অবলম্বন ক'রে একদিন সুযোগ বুঝে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর তো মধু খাওয়া শেষ হয়েছে, এখন শুকনো ফুলে আর কি প্রয়োজন? তার পর আমার অবস্থা যা হ'লো অতি সহজেই বুঝতে পারবে। আমি তখন একান্ত নিরুপায়! না জানি পথ-ঘাট, না বুঝি বিদেশ-বিভুইয়ের আদব-কায়দা! আমি তখন ঠিক যেন—হিন্দুর গরু আর মুসলমানের শূকর! কেউ বা গতর খাটিয়ে খেতে বল্লে; আর কেউ অযাচিতভাবে উপদেশ দিলে—'রূপ ও দেহ বিক্রি ক'রে পেট চালাও গে!' কিন্তু দুটীর একটীও আমার পছন্দ হ'ল না। এমন সময় হঠাৎ একদিন এই আশ্রমের খোঁজ পেয়ে, মনে ভাবলাম এতদিনে অকুল সাগরে বুঝি কুল পেলাম!

তারপর একদিন এই আশ্রমের দরজায় এসে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনি হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা করে নিলেন। এ যেন দিল্লীর লাড্ডু! কিন্তু ভিতরে ঢুকে সেই দিনই বুঝতে পারলাম, বাহির হতে যা ভেবেছিলাম, আসলে তার সবই উল্টো! যখন জানতে পারলাম, বাঙলার বাইরে যে কোনো দেশের লোক এসে মোটা টাকা দিয়ে আমায় বিবাহ করে নিয়ে যাবে, তখন ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়ে উঠলো! ভাবলাম, বাঙালীর মেয়ে, বাঙলা ছেড়ে, সেই সুদূর পশ্চিমে অপরিচিতদের মধ্যে যেতে আমি পারব না! ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আমায়

তাহারা পণ দিয়ে আমাকে ক্রয় ক'রে নিয়ে যাবে। কড়া ক্রান্তিতে আমার কাছে তারা আপন প্রাপ্য আদায় করবে। যার কাছে যাব আমি তার ভাষা জানিনে। সেও আমার ভাষা বোঝে না, আকারে-ইঙ্গিতে মনের ভাব বুঝে নিয়ে তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে, শুধু তাই নয়, যার সঙ্গে কিছুতেই মনের মিল হবে না—তাকেই দেহ পর্য্যন্ত দান করতে হবে! তার পর এখানকার সনাতন নিয়ম– যারা স্ব-ইচ্ছায় যেতে চায় তাদের বিষয়ে কোন কথাই নাই। কিন্তু যারা যেতে চায় না, তাদের জোর ক'রে পাঠানো হয়। যেতে না, চাইলে তাদের উপর নাকি অমানুষিক অত্যাচারও হয়!"

—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এ সব কি বাহিরের লোক জানতে পারেনা ?"

—"কে জানবে ? যে সকল মেয়ে এখানে আসে, তা'দিগকে কোথাও পত্র লিখতে দেওয়া হয় না। যদি বা কখনও দেয়, তবে ম্যানেজার স্বয়ং সে পত্র পড়ে তবে ডাকে দেবার হুকুম দেন। একবার কতকগুলি মেয়ে, সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে, ছাদ থেকে তাদের দুঃখ-কষ্ট লিখে রাস্তায় ফেলে দিয়েছিল। তার পর একদিন ভিতরে কান্নার আওয়াজ পেয়ে, পাড়ার কয়েকটা যুবক, সদর-দরজা ভেঙে মেয়েদের উদ্ধার করতেও এসেছিল, কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।"

—"কিছুই হয় নি, কেন ?"

—"এখানকার ম্যানেজারটী বড় ঘুঘু। সে তৎক্ষণাৎ একটী জরুরী সভা করে সাধারণকে বুঝিয়ে দিলে যে, যে সকল অভিযোগ আনা হয়েছে তা সমস্তই ভুল ও মিথ্যা। সে দিন জনকয়েক আশ্রমবাসিনী মহিলাকে

আশ্রমের নিয়ম ভঙ্গের জন্য শাস্তি দেওয়া হ'য়েছিল সত্য, কিন্তু পাড়ার যুবকেরা সাধারণের প্রতি এই আশ্রমের বিতৃষ্ণা উৎপাদনের জন্য যা সব পাঁচজনের কাছে জানিয়েছেন—তার একটিও সত্য নয়। এখানে অনাথা বিধবারা যে কি সুখে এবং কত নিশ্চিন্ততার সঙ্গে বাস করেন, তা আমাদের এই দেশের প্রত্যেক খ্যাতনামা ব্যক্তিই ভালো জানেন। দেশের সর্ব্ববরেণ্য ব্যক্তিরাই এ আশ্রমের পরিচালকমণ্ডলী! সুতরাং অন্যায় বা অবৈধ ব'লে কোনো কিছুই যে এখানে ঘটতে পারে না—তা সহজেই বোঝা যায়! এমনিতর নানা কথায় সুন্দর এক বক্তৃতা দিয়ে ম্যানেজার বাবু সেদিন জয়লাভ করলেন! বক্তৃতার সময় আশ্রমের উদ্দেশ্য, আশ্রমবাসিনী বিধবাদের বিবাহে সম্মতি থাকলে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পাত্রের সঙ্গে তাদের বিবাহ দেওয়া! বিবাহে, কখনো কখনো স্বেচ্ছায় পাত্রপক্ষ দিতে চাইলে আশ্রমের জন্যই পণ গ্রহণ করা,—এই সব ব্যাপার ঘুঘু ম্যানেজারটি এমন প্রাঞ্জল ভাষায় সভার মধ্যে সকলকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সন্দেহ চুলোয় যাক্—সভাশুদ্ধ লোক,—দেশের হু'শো হোমড়া-চোমড়া নেতা, সবই একবাক্যে ম্যানেজারকে হাততালি সহ ধন্যবাদ দিয়ে দিলেন! এরই নাম—জোর যার মুলুক তার;—লাভের মধ্যে এই হ'লো—সেই যে কয়েকটী যুবক স্বেচ্ছায় সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল, তাদেরই শাস্তি হয়ে গেল!"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সাধারণের চাঁদার উপর যখন আশ্রম চলে, তখন সাধারনে কেউ এর হিসেবটাও কোনো দিন দেখতে চায় না?".

মণিদি বলিল,—"সাধারণের এ সব দেখবার ও খোঁজ রাখবার সময় কই? ঘরের খেয়ে বনের মহিষ তাড়াতে ক'জনে এগিয়ে আসে?"

আমি কহিলাম,—"বুঝতে পেরেছি। এ যেন ঠিক সেই পিপীলিকার মাকড়সার জালে বন্দী হওয়ার মত! কিন্তু তুমি ম্যানেজারের নজরে পড়লে কেমন ক'রে?"

মণিদি একটু হাসিয়া বলিল—"বুড়ো আগে বাঁধা ছিল গৌরমণির আঁচলে! কিন্তু আমি এখানে আসতেই, নজরটা ঘুরে আমার উপর পড়লো। দূতি ঘন ঘন যাওয়া আসা করতে লাগলো। ভাবে—ভাষায় বুড়ো তার মনের ভাবও একটু-একটু ক'রে আমাকে জানাতে লাগলো। আমি প্রথমে রাজী হইনি, তারপর উপায় নাই দেখে মৌনং সম্মতি লক্ষণং দেখিয়ে দিলাম। ওদিকে গৌরমণিকেও, দেড়হাজার টাকায় ভারতের পশ্চিম প্রান্তে চালান ক'রে দিলে। আমি তখন ভেবে দেখলাম, লোকের দুয়ারে-দুয়ারে ভিক্ষে ক'রে বেড়ানো অথবা সেই অজানা দেশে অপরিচিতের মধ্যে,—না জানি তাদের ভাষা, না জানি তাদের আচার ব্যবহার, তবু তাদের মন রেখে নিজের দেহ দান ক'রে বা নিজের রূপ-যৌবনের বিপণি খুলে বসার চেয়ে, এভাবে বাস করা আমার পক্ষে ঢের ভাল। আমার ত শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ দুই পক্ষ হয়েছে, এবার না হয় প্রেতপক্ষই হবে!"

আমি বলিলাম,—"এই আশ্রমের দুইটী আইনের মধ্যে একটাতে ও আমি রাজী নই। আমি বিয়েও করবোনা, ম্যানেজারকেও ভজনা করবোনা, এতে জান কবুল।"

মণিদি আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, "দেখ, এখানকার অধিকাংশ মেয়েই এই দুটীর মধ্যে একটীতেও রাজী হয় না, কিন্তু যখন তাদের রাজী করবার জন্যে যোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন

করা হয়, তখন বাধ্য হয়েই সকলকে রাজী হতে হয়। উপস্থিত তুমি এ সব মনের ভাব কারো কাছে প্রকাশ ক'র না। এখানে গোঁয়ারতুমি করলেই সমূহ বিপদ! আমি তোমাকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করব। উপস্থিত দিন কতক তো শান্তিতে থাক। আপাততঃ তোমার উপর কোনো পীড়ন হবে না। কেবল বুড়ো আমার দ্বারা তোমাকে বশ করবার চেষ্টা করবে। আর আমি কেবল তোমাকে নিয়ে তাকে খেলাব। আর আশায় আশায় রাখব। এর মধ্যে ভগবান নিশ্চয়ই কোন একটা উপায় ঠিক করে দেবেন।···কি আর বলবো ভাই, এই জেলখানাতে থাকতে আমারও প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। কিন্তু নিয়তির খেলা, কোনো উপায় নেই।"

২০

দেখিতে দেখিতে এক পক্ষ কাটিয়া গেল। প্রথম প্রথম আশ্রমের অধিবাসিনীদের উপর অত্যাচার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া পড়িতাম। প্রাণেও আঘাত লাগিত বড় কম নয়। কিন্তু দেখিতে দেখিতে সমস্তই সহ্য হইয়া গেল। থাক্ সে সব বহু দিনের কথা। কিন্তু সেই সব অসহায়া নারীর করুণ আর্ত্তনাদ যেন আজিও আমার কাণে লাগিয়া আছে!

একটু একটু করিয়া আমার জীবনের সমস্ত কথাই মণিদিকে বলিয়া ফেলিলাম। এক পথের পথিক বলিয়া, দুই জনের মধ্যে বন্ধুত্বও

বেশ গাঢ় হইয়াছিল। এক দিন রাত্রে, খাওয়া দাওয়ার পর দুই জনে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম। মণিদি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু আমার মনের মধ্যে নানারূপ চিন্তা আসাতে ঘুম আসিতেছিল না। নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতে ভাবিতে, সমস্ত পুরাতন কথা একের পর এক করিয়া আমার মনে পড়িতে লাগিল। সেই ফতিমা বিবির সাহায্যে মুসলমান বাড়ী হইতে পলায়নের কথা মনে হইতেই; হঠাৎ মনে হইল, এখান হইতেও তো পলাইতে পারি! আমি জানালার দিকে চাহিয়াই আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলাম। রাত্রির নির্জ্জনতা বা গভীরতার কথা বিস্মৃত হইয়া চীৎকার করিয়া মণিদিকে ডাকিতে লাগিলাম।

আমার চীৎকারে মণিদির ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করাতে আমার মনের ভাব তাহাকে সমস্তই খুলিয়া বলিলাম। সে-ও উৎসাহের সহিত বলিল, "হ্যাঁ, এ হ'তে পারে। কতদিন জানালার দিকে তাকিয়েছি কিন্তু পালাবার কথা আমার মনে হয়নি। জানালার একটা গরাদে, কোনো রকমে খুলে' কাপড় বেঁধে ঝুলে পড়লেই তো হ'ল! বেশী উঁচু ও নয়; এম্‌নিতেই ঝুলে' লাফিয়ে পড়া যায়। তবে অভ্যাস নাই, পা মচ্‌কে যেতেপারে এই যা ভয়। কিন্তু সত্যি সত্যি পালাতে হ'লে উপস্থিত কাজ যে কোন প্রকারে জানালার একটা গরাদে খোলা।"

আমাদের দুই জনের মধ্যে অনেক আলোচনার পর ঠিক হইল, একখানা ছুরি জোগাড় করিয়া, কোন প্রকারে জানালার কাঠ কাটিয়া,

গরাদে বাহির করা! তাহাতেও যদি সুবিধা করিতে না পারি, তবে কেরোসিন তেল ঢালিয়া জানালার কাঠ পুড়াইয়া গরাদে বাহির করিতে হইবে। সে রাত্রে দুই জনের কাহারও আর ঘুম আসিল না। এ নরক হইতে বাহির হইবার জন্য অনেক মতলব মনে আসিতে লাগিল। আসন্ন মুক্তির আশাতে প্রাণের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল!

সকালে উঠিয়াই মণিদি কৌশলে ম্যানেজারের নিকট হইতে একখানি ছুরি সংগ্রহ করিয়া আনিল। ম্যানেজার খুব সাবধানে থাকিতেন; কারণ কোনো আশ্রমবাসিনী তাঁহার করুণার খাতিরে কোনদিন আত্মহত্যা করিয়া বসে, সেই জন্য চারিদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অর্থাৎ তেতালার ছাতে উঠিবার সিঁড়ি বন্ধ। বাহিরে কোন দড়া দড়ি পড়িয়া থাকিত না। ছুরী প্রভৃতি আশ্রমবাসিনীদের কাছে রাখিবার হুকুম ছিল না। এমনকি তরকারী কোটা বঁটী পর্য্যন্ত ম্যানেজারের ঘরে থাকিত। মণিদির উপর ম্যানেজারের নেক্‌নজর থাকার দরুণ তাহার অনেক আবদার তিনি সহ্য করিতেন। এই জন্য ছল ছুতা করিয়া তাহার নিকট হইতে ছুরী সংগ্রহ করাটাও মণিদির কাছে কঠিন হয় নাই।

ছুরী পাইয়া কতক কতক কাজ আগাইয়া রাখিয়াছিলাম। তার পর সকাল সকাল আহারাদি সারিয়া রাত্রে পুনরায় কাজ আরম্ভ করিলম।

মণিদি বল্লে, "ভাই, একবার ম্যানেজারের কাছে শেষ হাজিরটা দিয়ে আসি। নতুবা বুড়োর খেয়াল চাপ্‌লে ডেকে পাঠাবে, নয়ত নিজেই এসে হাজির হবে।"

এই বলিয়া সে হাজিরা দিবার জন্য নীচে নামিয়া গেল। আমিও ইতি মধ্যে জানালার গরাদে খুলিয়া ফেলিলাম।

রাত্রি যখন এগারটা, তখন মণিদি আসিয়া কহিল, "সিদ্ধি খেয়ে ছাতুখোর খুব ঘুমুচ্ছে। আমি তাকে বেশ আদর ক'রে ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে এসেছি এবং পুরস্কার স্বরূপ তার হাত বাক্সে, যে কটি টাকা ছিল, আঁচলে বেঁধে এনেছি।"

—"মণিদি, চুরি করলে ?"

—"চুরী ত করি নি, বাটপাড়ি করেছি ; বুড়োর কি বাবার টাকা ? যদিই বা হয়, তাহ'লেও অমন বক ধার্ম্মিকের টাকা এমনি করেই নেওয়া উচিত। এই যে আমরা দুটী অনাথা পথে গিয়ে দাঁড়াব, আমাদের হাতে যদি কিছু না থাকে, ত কি করে চলবে ?"

—"ভগবান চালিয়ে দেখেন।"

—ভগবান ছাড়া আর দিচ্ছে কে ? আমরা যা করি, সবই ত তিনি করান। জাননা, "ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদি স্থিতেন···যাক···এদিকের কতদূর ?"

—"সব ঠিক ! এখন ঝুলে' পড়লেই হয়।"

আমি একখানা কাপড় বাঁধিয়া ছিলাম, সে খানা খুলিয়া মণিদি দুইখানা কাপড় বাঁধিয়া তাহাতে এক হাত অন্তর গিঁট দিয়া বলিল "এই গিঁটের মধ্যে পা দিয়ে দিয়ে নামতে হবে ঠিক যেন মইয়ের মত।"

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

রাত্রি গভীর! বাড়ীতে জন মানবের সাড়া নাই। কেবল অদূরে পথ দিয়া দু'একখানি মোটর যাইতেছিল ভেপু বাজাইয়া। কখনো বা রিক্সা ঠুং ঠাং করিয়া।

প্রথমে আমি সেই কাপড়ের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিলাম। নামিবার সময় ঘন ঘন বুকটা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতে ছিল। তার পর নামিল মণিদি। তখন দুজনে নানা গলি পথ ঘুরিয়া ফিরিয়া, সারকুলার রোড, হাতিবাগান হইয়া, বামুনদির বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া উপস্থিত হইলাম

দু'জনে প্রাণের দায়ে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিতেছি, মনের মধ্যে কত যে আশঙ্কা আসিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। কখনো মনে হয় পুলিশে ধরিবে। ধরাটা তো আশ্চর্য্য নয়! এত রাত্রে দু'টি যুবতী নারী সহায়হীন অবস্থায় পথে নামিয়াছি, সন্দেহ যে সতঃই আসিবে।

আবার কখনো মনে হয়, এতক্ষণে হয়তো ম্যানেজারের সিদ্ধির নেশা টুটিয়া গিয়াছে, তিনি ভুঁড়ি ফুলাইয়া ঠিক যেন কামান দাগিবার মতই দ্রুত ধাওয়া করিতেছেন! ঐ বুঝি তাঁর নিশ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ আসে কাণে!

ভয়ে জীবাত্মা বুঝি দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া যায় আর কি! তবু সাহস করিয়া পিছনে চাহিয়া দেখি! মধুসূদন রক্ষা করিয়াছেন! ম্যানেজারের নিশ্বাস নয়। আমার পরম হিতৈষিনী লিলি বিশ্বাসের রিক্সা গাড়ী আসিতেছে। ইহারই নাম, 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে!'

তাঁহাকে দেখিয়া আমার সাহস হইল। আমরা তাঁহার কাছে আগাইয়া গিয়া বলিলাম, "লিলিদি, আপনি ঠিক কথাই বলেছিলেন।"

তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, "প্রমীলা! এ কি! এত রাত্রে! ব্যাপার কি? সঙ্গে ইনি কে?"

—"সে অনেক কথা লিলিদি, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি ক'রে বলি ?"

লিলি বিশ্বাস আমাদিগকে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন।

কোন কথা গোপন না করিয়া আশ্রমের সমস্ত কথাই অকপটে তাহার নিকটে খুলিয়া বলিলাম। তারপর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, "তাঁরা নিশ্চয়ই খোঁজ করবে, জানতে পারলে হয়তো জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যাবে।"

লিলি বিশ্বাস বলিলেন, "সেটা খুবই স্বাভাবিক। তবে দেশে এতটা অরাজক হয়েছে বলে মনে হয় না। আজ রাত্রে তোমরা বরং আমার বাসাতেই থাকো। কাল সকালে আমি বামুনদিদির কাছে খবর পাঠাবো।"

মিস্ লিলিবিশ্বাস অতি যত্নের সহিত নিজের ঘরেই আমাদের শোবার জন্য বিছানা করিয়া দিলেন। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আশ্রমের ব্যাপার ও আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি করা উচিত তাহারই আলোচনা চলিল।

অতি প্রত্যূষেই আমাদের সকলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মিস্ লিলি-বিশ্বাস বামুনদিদিকে আমাদের আগমন সংবাদ দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন।

অনতি বিলম্বে বামুনদিদি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমাদিগকে দেখিয়া তিনিও খুব আনন্দিত হইলেন। তাঁহাকে আশ্রমের ঘটনা সমস্তই বলিলাম এবং ইহাও জানাইলাম যে, আশ্রমের লোক আমাদিগকে জোর করিয়া পুনরায় ধরিয়া লইয়া যাইবে।

তিনি রাগিয়া বলিলেন, এটা কি মগের মুলুক? কা'র ঘাড়ে ক'টা মাথা আছে একবার দেখতে চাই! আসুক না ধরতে একবার দেখি।

আমরা এ সকল বিষয় আলোচনা করিতেছি এমনি সময় দেখি, সত্যই আশ্রমের ম্যানেজার, দু'জন দরওয়ান ও দু'টি ঝি সঙ্গে লইয়া, একেবারে মিস্ লিলি বিশ্বাসের দরজার নিকট আসিয়া, লিলি বিশ্বাসকে ডাকিয়া বলিলেন, গত রাত্রে আপনার সেই প্রমীলা, আশ্রমের আরো একটি মেয়েকে ফুস্‌লে নিয়ে চ'লে এসেছে। সম্ভবতঃ তারা আপনার এখানেই আছে। আশ্রমের শৃঙ্খলা রক্ষার্থ আপনি দয়া ক'রে বুঝিয়ে তাদের পুনরায় আশ্রমে পাঠিয়ে দিন। আমি তাদের নিয়ে যেতে এসেছি।

মিস্ লিলি বিশ্বাস জবাব দিলেন—"তারা আপনার আশ্রমে পুনরায় যেতে রাজী নয়।"

ম্যানেজার তখন মেজাজ গরম করিয়া বলিলেন, তারা যেতে প্রস্তুত না থাকলেও আশ্রমের নিয়ম ও কল্যাণের জন্য তাদের ধরে নিয়ে যেতে আমি বাধ্য।"

এই কথা শুনিয়া মিস্ লিলি বিশ্বাস ভয়ানক রাগিয়া গিয়া বলিলেন, "এতক্ষণ আপনার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলাই দেখছি অন্যায় হয়েছে! আপনি আশ্রমের মধ্যে যে সব কীর্ত্তি করেছেন, বা এখনও করছেন, তাতে আমাদের উচিৎ এখনই এই দণ্ডে পুলিশে খবর দেওয়া।"

মিস্ বিশ্বাস তাঁহার সদর দরজায় দাঁড়াইয়া কথা বলিতেছিলেন আর আমরা একটু দূরে, তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলাম।

এমনি সময় ঝি দুইটী কোন্ ফাঁকে আমাদের কাছে আসিয়া;

আমাদের দুই জনের হাত ধরিয়া হিড় হিড় করিয়া টানিয়া দরজার বাহিরে আনিয়া ফেলিল! দরজার বাহিরে আসিতে না আসিতেই দরওয়ান দুইটী তখন আমাদের হাত চাপিয়া ধরিয়া পূর্ব্ব হইতেই ঠিক করিয়া রাখা একখানি গাড়ীতে আমাদিগকে উঠাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ব্যাপার এত শীঘ্র হইয়া গেল যে উপস্থিত থাকিয়াও বরাবর লক্ষ্য না করার দরুণ কেহই কিছু করিতে পারিল না। কিন্তু বামুনদিদি চীৎকার করিতে করিতে আসিয়া পিছন হইতে মণিদির চুল ধরিয়া ফেলিল। মিস্ বিশ্বাসও তখন সাহায্যের জন্য লোক ডাকিতে লাগিলেন।

একদল মুচি ঠিক মিস বিশ্বাসের বাড়ীর সম্মুখেই থাকিত। তাহারা তখন আহার সমাপনান্তে কার্য্যে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এমন সময় চীৎকার শুনিয়া কি হইয়াছে দেখিবার জন্য তাহারা আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহারা সকলেই বামুনদিদি ও মিস্ বিশ্বাসকে অত্যন্ত সম্মান করিত। বামুনদিদি তাহাদিগকে আদেশের ভঙ্গীতে চীৎকার করিয়া বলিলেন, "হতভাগারা, দাঁড়িয়ে কি দেখছিস্? গুণ্ডারা এদের যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, ব্যাটাদের মেরে ভাগিয়ে দে!"

বামুনদিদির মুখ হইতে কথা বাহির হইতে না হইতে মুচির দল মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাদিগকে আটকাইয়া ফেলিল এবং তাহাদের হাতের লৌহ দণ্ডদ্বারা দরওয়ান দুইটীকে নির্ম্মমের ন্যায় প্রহার করিতে লাগিল। ব্যাপার সুবিধার নয় বুঝিয়া, ম্যানেজার ঝি দুইটী সহ তৎক্ষণাৎ 'য পলায়তি স জীবতি' পন্থা অবলম্বন করিলেন। এবং পৈতৃক প্রাণ বাঁচাইবার জন্য হিন্দুস্থানের অধিবাসী মহাবীর দরওয়ান দুইটিও চোখ

কাণ বুঝিয়া, রাস্তার দুইধার হইতে মার খাইতে খাইতে পলাইয়া বাঁচিল। এ সব ব্যাপারে আমরা অতিশয় হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলাম।

বামুনদিদি তখন আদর করিয়া, আমাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং সে দিনের খাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

২১

এই কয়দিন মণিদির সহিত একসঙ্গে থাকার দরুণ, দুই জনের মধ্যে যথেষ্ট ভালবাসা জন্মিয়াছিল। আমি তাহার সহিত ব্যবহার করিয়া বুঝিতে পারিলাম, তাহার মন গঙ্গাজলের মত পবিত্র! দোষের মধ্যে ঝোঁকের মাথায় সর্ব্বদাই কাজ করে, একবারও ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া দেখে না। দেখিতে চায়ও না। ক্রমাগত আঘাত পাইয়া জীবনের উপর সে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। সর্ব্বদাই বলিত "যা হবার তা হবে, মিছি মিছি ভেবে মরি কেন?"

আমরা দুইজনে দিবা রাত্রি গল্প করিতাম। অবশ্য বেশীর ভাগ গল্পই আমাদের অতীত জীবন লইয়া!

একদিন বর্ত্তমানে কি করা যায়, এই সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে মণিদি বলিল, "ভাই, লোকের বাড়ী গিয়ে দাসী বৃত্তি করা আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।"

আমি বলিলাম, "তা ছাড়া কায়েতের মেয়ে, আর কি করতে পারি আমরা ?

"মাষ্টারী ধরণের কোন কাজ পেলে আমি করতে পারি। আর তা সব চেয়ে ভালঃ হয়। তাছাড়া বাড়ীতে ব'সে কোনো শিল্প কাজ ক'রেও পেটের ভাতের যোগাড় করা চলে।

—"সেলাইএর কাজ তো আমিও জানি, কিন্তু সে সব নেয় কে ?"

—"ঐ তো আসল সমস্ত! নেয় কে ? এ পোড়া বাংলা দেশে অনাথা বাঙ্গালী মেয়েদের সংভাবে, কোন কিছু ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ করবার একটিও পথ নেই।"

চার পাঁচ দিন পরে……

মণিদি বলিল, "প্রমীলাদি, আজ শনিবার, বাড়ীর কাছে থিয়েটার চল দেখে আসি।"

—"এখন কি ক'রে যাই ? বামুনদিদিকে বলা হয় নি। তাঁকে বলে তাঁকেও সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া তিনজনে গেলে তিন টাকা খরচ।"

—খরচের জন্য ভাবনা কি, তিনটে টাকা তো ? সে না হয় আমিই দেব। মনে নেই ?—আমার কাছে গোটা কতক টাকা আছে যে! আসবার সময় চেয়ে এনেছিলাম—সেই ম্যানেজারবাবুর হাত বাক্স থেকে !"

—"এ সময় বাজে খরচ করা কি উচিত ?"

—"উচিত কি অনুচিত, সে কথা ভেবে কোনোদিন কোনো কাজ করি নি ভাই! যখন যেটা করবার ইচ্ছা হয়েছে, মন্দ হলেও সেটা

দমন করবার চেষ্টা করা আমার স্বভাবে নেই। তা যদি থাকতো তা'হ'লে অদৃষ্টের চাকা আমার অন্যদিকে ঘুরতো। যখন প্রাণে সখ চেপেছে, যেতে তখন হবেই।

আমি বলিলাম—"তোমার মত সবাই তো আর বেপরওয়া অদৃষ্টবাদী হ'তে পারে না। যাক্ যখন তোমার থিয়েটার দেখবার জন্যে প্রবল ইচ্ছা হয়েছে, তখন যাওয়া যাবেই, তবে আজকে আর নয়। আজ বামুনদিদিকে বলে কালকে তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া যাবে।"

আমার কথায় মণিদি রাজী হইল। এবং রাত্রে বামুনদিদিকেও বলিয়া রাজী করিয়া নিলাম। দেখিলাম থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা বামুনদিদিরও আছে।

তার পর দিন বৈকালে বামুনদিদি আর কাজে গেলেন না। যথা সময়ে আমরা তিন জনে থিয়েটারে গেলাম। সেদিনকার অভিনয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট নাটক খানি দেখিয়া আমরা তিনজনেই মহা তৃপ্তি লাভ করিলাম। অভিনয় কৌশল ও নাট্যকারের লিপি চাতুর্য্যে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

মণিদির নাটক খুবই ভাল লাগিয়াছিল। বাসায় ফিরিয়া বার বার সে ঐ নাটকের কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। পরের বুধবারে মণিদি আবার আমাদিগকে লইয়া জয়দেব নাটক দেখিয়া আসিল।

দিন কয়েক পরে একদিন মণিদি বলিল, "প্রমীলাদি, আমার নিজের পথ তো এক রকম ঠিক ক'রে নিয়েছি। আমি ভাই কোনো একটা

থিয়েটারে যোগ দেব। আগেই তো বলেছি,—পরের বাড়ী দাসীবৃত্তি ক'রে দিন চালানো আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না। তার চেয়ে থিয়েটারে গিয়ে একটা বিষয় নিয়ে মন মেজাজ ভালো থাকবে, আর থাকব। যা উপায় করব, তাতে এক রকমে চলে যাবে।"

আমি অবাক হইয়া তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বলিলাম, "কোনো ভদ্রলোকের মেয়ে থিয়েটারে যোগ দিয়েছে, এখনও পর্য্যন্ত এ-কথা শুনি নি। যত খারাপ চরিত্রের মেয়েরাই থিয়েটার করে শুনেছি। আর জানত, সঙ্গদোষে শত গুণ নাসে।" তুমি নিজের মন যতই দৃঢ় করনা কেন, এক ঝুড়ি পচা আমের মধ্যে, একটা ভাল আম কতদিন ভাল থাকবে? তোমার অল্প বয়স, তাতে সুন্দরী। খারাপের দিকে তোমার মন না থাকলেও, পাঁচ জনে তোমার মন টলাবে। তারপর ধাপে ধাপে এত নীচে নেমে পড়বে যে, তখন মনে হাজার অনুতাপ হলেও আর ফিরতে পারবে না।"

মণিদি হাসিয়া বলিল, "বুঝতেই তো পারছ, আমার তাঁতি-কুলও গেছে বৈষ্ণব কুলও গেছে। সমাজ হতে যখন না বুঝে চলে এসেছি, তখন সমাজ আর আমাকে ফিরে নেবে না। আর যতদিন এ পোড়া-রূপ ও যৌবন আছে, ততদিন কামুক পুরুষগুলোও পেছনে লেগে থাকবে। কোনো বাড়ীতে শান্তিতে দাসী বৃত্তি করতেও দেবে না। আমাদের মত অনাথা স্ত্রীলোকদের জন্য, এ অভিশপ্ত দেশে এমন কোন ব্যবস্থা নাই, যেখানে গেলে গতর খাটিয়ে শান্তিতে জীবনের শেষ অংশটা কাটাতে পারি। থিয়েটারে যারা অভিনয় করে, তাদের মধ্যে ভদ্রাভদ্র বিচার করলে চলবে কেন? আজ পর্য্যন্ত কোন ভদ্রঘরের মেয়ে

অভিনয় করতে যায় নি বলেই তো বাধ্য হয়ে পতিতা দ্বারা অভিনয়ের কাজটা চলে আসছে। যখন একটা একটা ক'রে ভদ্র-ঘরের মেয়ে থিয়েটারে অভিনয় করতে আরম্ভ করবে, তখন দেখবে যে কোনো মেয়েদের থিয়েটার করলে আর অপমানের কাজ বলে মনে কোন সঙ্কোচ থাকবে না। আমি-ই না হয় প্রথমে এ-পথ দেখাই। আর এক কথা আমি নিজে বেশ জানি, আমি চরিত্র হারিয়েছি, সমাজ হতে বেরিয়ে এসেছি, কাজেই নিজেকে আর ভদ্র কুল বধূ বলে পরিচয় দিতে পারি না। নিশান তুলে, ডঙ্কা বাজিয়ে বাজারে না বসলেও, আমার অন্তর বেশ জানে আমিও ঐ সাধারণ অভিনেত্রী-মেয়েদের মধ্যেই একজন। অবস্থা বৈগুণ্যে যখন চরিত্র হারিয়েছি, তখন না হয় একবার ডুব দিয়েই দেখি, জল কতখানি! পারি তীরে ফিরবো না হয় অতল-জলে ডুবে এ জীবনটা ঐখানেই শেষ করবো। আমাদের মত নারীর জীবন কোথায় গিয়ে শেষ হচ্ছে, সমাজের হোমরা চোমরা ব্যক্তিরা কোন দিনই সে সম্বন্ধে কোনো খোঁজ রাখেন নাই, আর রাখবেনও না। সমাজে যখন ফিরতে পারবো না, বাহিরেই আত্মীয় স্বজন বিহীনা হয়ে থাকতে হবে, তখন ওদের সঙ্গেই আত্মীয়তা পাতিয়ে রাখি না কেন! তুমি ভাই এখনও পবিত্রা আছ, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, চিরকাল এমনি পবিত্রাই থাকো। আমার জন্যে তুমি কোনো চিন্তা ক'রো না বোন্। ভেবে-চিন্তে কোনো দিন কোনো কাজ আমি করিনি, এখনও যে করতে পারবো, তাও মনে হয় না, আর হঠাৎ যে প্রকাশ্যে বার-বণিতার ব্যবসা গ্রহণ করতে পারবো, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে শেষ পর্য্যন্ত কপালে

কি আছে কে জানে। ভগবান না করুন, যদি পা পিছলে ঐ ময়লা-কূপে পড়তেই হয়, তবে যে সব চরিত্রহীন পুরুষ আমার সংস্পর্শে আসবে তাদিগকে সহজে আমি রেহাই দেব না'। প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্যে তাদের বুকে মুখে সর্ব্বাঙ্গে, এমনকি কলিজায় পর্য্যন্ত এমন তীব্রভাবে দংশন করবো, যাতে সহজেই তারা বুঝতে পারবে নারী যেমন অমৃত পরিবেশন করতে জানে তেমনি ভাণ্ডারে তার গরলেরও অভাব নাই।"

দেখিলাম মণিদি বেশ একটু উত্তেজিতা হইয়া উঠিয়াছে। আমি আর তাহার সহিত এ বিষয়ে বেশী আলোচনা করিলাম না। এই কয়দিনের পরিচয়ে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম সে বড়ই জেদী। যাহা সে ধরিয়াছে তাহা করিবেই!......

দিন কতকের মধ্যেই মণিদি এক পেশাদারী থিয়েটারের দলে ভর্ত্তি হইয়া পড়িল। থিয়েটারের ম্যানেজার তাহার বয়স, রূপ লেখা-পড়ায় জ্ঞান, ও গলার সুরের মিষ্টতা দেখিয়া, তাহাকে দলে টানিতে একটুও আপত্তি করিলেন না।

থিয়েটারে ভর্ত্তি হওয়ার পর, পনের দিনের মধ্যেই মণিদি নিজে আলাদা বাসা করিয়া আমাদের নিকট হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় সে আমাকে সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু আমি ঘৃণার সহিত তাহার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলাম।

ইহার পর প্রায় তিন-চার মাস কাটিয়া গিয়াছে......মণিদি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে বেড়াইতে আসিত। আমি লক্ষ্য করিলাম, দিনের পর দিন মণিদির বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং এই সামান্য তিন

মাসের মধ্যেই সমস্ত দেহখানি তাহার স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে !

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম, "মণিদি, ব্যাপার কি ?"

মণিদি একটু হাসিয়া বলিল, "অনেক কর্ত্তাই আমার পিছনে লেগেছে ভাই, কাজেই বাধ্য হয়ে তাদের ভেতর থেকে শাঁসালো দেখে এক আড়ো-কাপ্তেনকে পদাশ্রয় দিয়েছি। শুধু এই গহনাগুলো নয়, মাস-খানেকের মধ্যে ছাতুখোর প্রভুটি এই ক'লকাতা সহরে আমার নামে একটা বাড়ী কিনে দেবে।......যাক্—সৎ পথেই হোক আর অসৎ পথেই হোক, কায়দা করে নিজের ভবিষ্যৎটা সাফ্ করে নিয়েছি! এর পর ইচ্ছে হলে দিব্যি গলায় ত্রিকণ্ঠি-মালা নিয়ে, হাতে হরিনামের ঝুলি ঝুলিয়ে নবদ্বীপের বৈষ্ণবী সাজতে পারবো। অথবা লছমনঝোলার পাহাড়ে ব'সে 'ত্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ' ব'লে চীৎকার করতেও আমার বাধবে না।

আমার দুঃখও হইল, রাগও হইল। মুখ ফুটিয়া বলিলাম, "এত শীঘ্র এত উন্নতি তোমার হয়েছে!......যাক্......তুমি ভাই আর আমার কাছে এস না। প্রলোভন থেকে দূরে থাকাই এখন আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য।"

সে সতৃষ্ণ নয়নে আমার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে। আর আমি তোমার কাছে আসবো না; তবে যদি কখনও বিপদে পড়ো, এ-হতভাগিনী মণিদিকে তোমার স্মরণ ক'রো। মনে রেখো ভাই, দরকার হ'লে তোমার জন্যে আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকবো।"

এই কথা কয়টী বলিয়া সে অতি দ্রুত চলিয়া গেল। আমি লক্ষ্য করিলাম, যাইতে যাইতে সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিতেছে!

আমারও প্রাণের মধ্যে কি যেন হাহাকার করিয়া উঠিল!

২২

তিন মাসের মধ্যে চারি জায়গা ঘুরিয়া আসিলাম। যেখানেই দাসী-বৃত্তিতে ভর্ত্তি হই না কেন, এ পোড়া রূপ ও বয়সের জন্য একটা না একটা উৎপাৎ আসিয়া হাজির হয়। কাজেই আমাকে বাধ্য হইয়া কাজ ছাড়িয়া পুনরায় বামুনদিদির আশ্রয়ে ফিরিয়া আসিতে হয়।

মহাজনবাবুর মধ্যম পুত্র সুধীরবাবু মধ্যে মধ্যে আমাদের খোঁজ-খবর লইতে আসিতেন। আমি একদিন তাঁহাকে রূঢ় ভাষায় এমন অপমান করিয়া তাড়াইলাম যে, সেই হইতে আর তাঁহার টিকি দেখা যায় নাই।

সেদিন আহারাদির পর, বামুনদিদির ক্ষুদ্র ঘরখানিতে আঁচল বিছাইয়া, শুইয়া শুইয়া আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতেছিলাম, এমনি সময় বামুনদিদি তাঁহার দৈনন্দিন কাজ সারিয়া ঘরে আসিলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। মন ছিল ভারাক্রান্ত, কথাবার্ত্তা কিছুই বলিলাম না।

বামুনদিদি বলিলেন, "প্রমীলা, তোমার জন্য একটা ভালো বাড়ীতে

কাজ ঠিক ক'রে এসেছি। সেখানে তোমাকে বাসন-টাসন মাজতে হবে না। কাজ হচ্ছে খালি ফাই-ফরমাস খাটা।"

—"অনেক বাড়ীতেই তো ঘুরে এলাম, আরো কত ঘুরবো কে জানে! যাক্......এবারকার কাজে ফাই-ফরমাসের মধ্যে অন্য কিছু নেই ত?"

—"আরে না না। মস্ত জমিদারের বাড়ী। রাঁধুনী, ঝি, চাকর অনেক আছে। চাকরে বাজার করে।* বাহিরে ঝি আছে বাসন মাজে। তোমার কাজ হবে তরকারী কোটা, বাঁটনা বাঁটা, পান সাজা আর জমিদারের পুত্রবধূর ফাই-ফরমাস খাটা! তাদের মন রেখে চলতে পারলে, দু'পয়সা আছে। একবার ঢুকতে পারলে সহজে জবাবও হবে না। জমিদার-গিন্নী লোক ভাল। ও-বাড়ীর সদর-নায়েবের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। রাস্তায় আজ হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল। তোমার কথা গুছিয়ে তাকে বল্লাম। হেসে বল্লে, বামুনদি, তোমার বাক্যি কি ঠেল্‌তে পারি! কাল মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এস: কালই বহাল ক'রে দেব ' তবে প্রথম মাসের বেতনটা তাকে দিতে হবে। ও-বাড়ীর ওটা দস্তুর!"

পরদিন সকালে বামুনদিদির সহিত জমিদার-বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রকাণ্ড চক্‌মিলান বাড়ী, দেউড়ীতে গালপাট্টাধারী দারোয়ান, সুমুখে তার মস্ত এক পেটা ঘড়ি টাঙ্গানো, মাঝখানে দামি বিদ্যুৎ-আলোর ঝাড় ঝুলিতেছে! ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল।

দীর্ঘকাল ধরিয়া অদৃষ্টের সঙ্গে সমান তালে সংগ্রাম করিয়া চলিতেছি, পরাজয়ের গ্লানিতে দেহ মন আমার জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে!

সহিষ্ণুতারও সীমা আছে তো!......আর কত সহিব?—হে ভগবান! অবলা নারীর প্রাণে আর কত সয়?

বামুনদিদি একটী বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সম্মুখে আমাকে লইয়া গিয়া হাজির করিলেন। তিনিই এ বাড়ীর সদর নায়েব এবং জমিদারবাবুর দক্ষিণ-হস্ত স্বরূপ।

একবার তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এই বুঝি তোমার লোক? সুন্দরী, বয়সও অল্প, তা হোক দেখে বোধ হচ্ছে, কাজ কর্ম্ম ভালই পারবে। যদি 'সুনজরে পড়ে' যায় চাকরী যাবার ভয় ত নেই বরং আখের গুছিয়ে নেবে।"

—"সে আপনাদের দয়া এখন তবে আসি।"

এই বলিয়া বামুনদিদি চলিয়া গেলেন। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর, নায়েব মহাশয় তাঁহার কাজ সারিয়া, চটি পায়ে দিয়া, চটাং চটাং শব্দ করিতে করিতে, আমাকে লইয়া, অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই গিন্নীর নিকট হাজির করিয়া দিলেন।

একাদিক্রমে ত্রিশ বৎসর এই বাড়ীতে চাকরী করার দরুণ বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বলিয়া, এ বাড়ীর অন্দরে নায়েব বাবুর অবাধ গতি ছিল। গিন্নী হইতে বাড়ীর বৌ পর্য্যন্ত সকলেই তাঁহার সহিত কথা বলিত। আবার দুষ্ট লোকেরা গিন্নীর সহিত নায়েববাবুর গুপ্ত প্রণয়ের ইঙ্গিতও করিতে ছাড়িত না।

"গিন্নী আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "কি জাত?"

"কায়স্থ!"

"কপাল কতদিন পুড়েছে?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"কে কে আছে?"

"কেউ নেই।"

তিনি আমার কথা শুনিয়া মুখে একটুখানি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "দেখছি তুমি আমাদের স্বজাতী মেয়ে। তোমাকে বাসন-টাসন মাজার কাজ করতে হবে না। তার জন্যে অন্য ব্যবস্থা আছে। তুমি সংসারের খুচরো কাজ করবে আর আমার বৌমার খাস ঝি হ'য়ে তাঁর ফাইফরমাস শুনবে। বাঁটনা বাঁটা, তরকারী কোটা প্রভৃতি কাজের জন্যে অন্য একটা লোক রাখলেই হবে।"

—"না মা, এর জন্যে আর অন্য লোক রাখতে হবে না। আমি সমস্ত কাজই পারবো।"

তিনি সস্নেহে আমার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলেন, "পার ত ভালই, তোমার বেতন ও ভাল হবে। না পার ক্ষতি নাই, নায়েবকে বলে দেব, অন্য লোক আনবে। বৌমার কাছে থাকার জন্যে তোমার মত ভদ্রঘরের একটী মেয়ে অনেক দিন হ'তেই আমি খুঁজছিলাম। তুমি এখানে মন দিয়ে কাজ কর, তোমার কোনই কষ্ট থাকবে না। আমরা বিশেষ দোষ না পেলে সহজে কারুকে জবাব দিই না।

দিন কতক কাজ করিবার পর, গিন্নী ও তাঁহার পুত্রবধূ আমার উপর খুবই সন্তুষ্ট হইলেন। বড়লোকের বাড়ীর কাজ, বহু ঝি-চাকর। সকলেই কাজে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করে। প্রাণ খুলিয়া কেহই কাজ করিতে চায় না। কোন প্রকারে দিন কাটাইতে পারিলেই বাঁচে! কিন্তু ফাঁকি দেবার কোনও চেষ্টাই আমার ছিল না। আমি কাজের মধ্যেই

দিবারাত্রি ডুবিয়া থাকিতে চাই এবং থাকিতামও। দাদার বাসায় একা-একা অনেকদিন সংসার চালাইয়াছি, সুতরাং এ-সব কাজে আমার কোনই কষ্ট বোধ হইত না। শুধু তাই নয়, 'কাজ করিয়া একটা অনাবিল আনন্দও পাইতাম।

জমিদারের পুত্রবধূ ছিলেন আমারই সমবয়স্কা। দেখিতে সুন্দরী ও বেশ সরল প্রকৃতির; অল্পদিনের মধ্যেই, বাড়ীর ঝি হইয়াও তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হইয়া গেল। তাঁহার ঘরের জিনিষ পত্র সব অগোছানো ছিল। একদিন বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া সাজাইয়া ফেলিলাম। গিন্নী তাহা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার ঘরও পরিষ্কার করিয়া সাজাইবার হুকুম দিলেন। হুকুম তামিল করার পরই, বাঁটনা বাঁটা, কুটনো কোটা কাজ হইতে আমি রেহাই পাইলাম, এবং সে-সকল কাজ করিবার জন্য অন্য ঝি আসিয়া ভর্ত্তি হইল।

মধ্যে মধ্যে আমি সাধ করিয়া বিকালের খাবার তৈয়ারী করিতাম। কপালগুণে আমার হাতের খাবার গিন্নীর খুবই ভাল লাগিল। শেষে এমন হইল, রাত্রে লুচির সহিত গিন্নীর জন্য তাঁহার মুখরোচক একটা তরকারী না করিলে তাঁর আর কিছুতেই তৃপ্তি হইত না।

.........মাস পাঁচ-ছয় বেশ সুখেই ছিলাম। কিন্তু বিধির প্রাণে আর তাহা সহ্য হইল না। গিন্নী একদিন বলিলেন, "দেখ, কর্ত্তার উপরের খাস ঘরটা তুমি মাঝে মাঝে দেখ। ঘরটা বড় নোংরা হ'য়ে থাকে।"

কর্ত্তা অর্থে স্বয়ং জমিদারবাবু, যখন থাকিতেন না, তখন যাইয়া গিন্নীর হুকুম তামিল করিয়া আসিতাম। বিধি বিড়ম্বনা, একদিন হঠাৎ

কর্ত্তার সহিত চোখো-চোখি হইয়া গেল; বলিতে লজ্জা করে, জীবনেও ধিক্কার আসে, তারপর হইতেই বুড়ো আমার পিছনে লোক লাগাইয়া জ্বালাতন আরম্ভ করিতে লাগিল।

বাড়ীতে গরবিনী বলিয়া একটা ঝি ছিল, এবং অনেক দিন হইতেই আছে। বয়স চল্লিশ হইবে। তাছাড়া কর্ত্তার খাস-কাজের জন্য "হরে" নামে একটা খানসামাও ছিল। বাড়ীতে প্রবাদ, এই গরবিনী ঝি কর্ত্তার অনুগৃহীতা এবং বড়ই প্রিয়পাত্রী। এখন বয়সে ভাঁটা পড়ায় কর্ত্তার খাস-খানসামা "হরের" অঙ্কশায়িনী হইয়া আছে।

খানসামা "হরে" ও তস্য প্রণয়িণী গরবিনী, কর্ত্তার দূত ও দুতি হইয়া, অনেক প্রকারে আমাকে বুঝাইতে লাগিল। যথা, আমি ভয়ানক বোকা, কর্ত্তার এরূপ প্রস্তাব অবহেলা করা উচিৎ নয়। আমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছি। কর্ত্তার প্রস্তাবে রাজী হইলে, আমার ভবিষ্যৎ জীবন সুখে কাটিবে...ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যখন তাহাদের সৎ পরামর্শে কিছুতেই রাজী হইলাম না, তখন গরবিনী আমাকে চাকরী যাইবার ভয় দেখাইতে লাগিল। আমি তাহাতেও রাজী না হইয়া চাকরীর মমতা পরিত্যাগ করিয়া এ বাড়ী হইতে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঝি হইলেও জমিদারের পুত্রবধূর সহিত আমার যথেষ্ট সখীত্ব জন্মিয়া- ছিল। তিনি আমাকে কোনো দিন দাসীভাবে দেখিতেন না। প্রাণ খুলিয়া গল্প করিতেন, এবং মনের কথা সবই অকপটে আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেন।

গরবিনী ও "হরে" খানসামার উপদ্রবে আমি এ বাড়ী ছাড়িবার

সঙ্কল্প করিয়া, একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "এ বাড়ীতে কাজ করা আমার আর পোষাবে না। পেছনে কেউ লেগেছে।"

তিনি নানাভাবে জেরা করিয়া আসল কথাটা জানিয়া লইলেন এবং বলিলেন, "এর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি আজই মাকে ব'লে সব ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি। মা কর্ত্তার বিষয়ে বড় কড়া, সদাই জোরে লাগাম ধরে থাকেন। কিন্তু ভাই, দুঃখের কথা আর বলবো কত শাশুড়ী ঠাক্‌রুণ আমার এমনি স্বার্থপর কর্ত্তাকে কড়া শাসন করতে যত সজাগ, নিজের ছেলেটির বেলায় তা নয়।

ছেলের বেলায় তিনি একেবারে হাল ছেড়ে বসে আছেন। এক মাত্র ছেলে ব'লে, আর বড়লোকের ছেলের চরিত্র খারাপ হওয়া স্বাভাবিক, এই মনে ক'রে, তাকে তিনি কিছুই বলেন না। ছেলের হাত-খরচা ছাড়াও, দরকার হ'লে শাশুড়ী তাঁর আদরের দুলালকে দু'পাঁচশো চাইবা মাত্র দিয়ে দেন। আর ছেলেটি মা'র কাছ হ'তে যখন-তখন টাকা আদায় ক'রে কুৎসিৎ আমোদ প্রমোদে সব খরচা করেন।"

—"সত্যিই তো! আমি এখানে পাঁচ-ছ'মাস আছি, একদিনও তো কই তোমার স্বামীকে রাত্রে তোমার ঘরে দেখলাম না! তিনি কি একেবারেই বাড়ী আসেন না?"

—"কোন রাত্রেই তো বাড়ীতে থাকেন না। ঘরে আসবেন কেমন ক'রে? কুস্থান হতে বেলা করে বাড়ীতে এসে, বাহিরে স্নান-আহার সেরে, বাহিরের ঘরেই বিশ্রাম করেন। তারপর আবার সময় হলে স্বস্থানে চ'লে যান। তবে টাকার দরকার হ'লে, আর মা'র কাছে সব সময় না মিললে মাঝে মাঝে আমারও ডাক পড়ে। কি করবো বোন্,

গত জন্মে হয়ত কারও স্বামী-সুখে বিঘ্ন হ'য়েছিলাম, তাই এ জন্মে আমি এই বিশ্রী শাস্তি ভোগ করছি! শাশুড়ী আমাকে এই ব'লে প্রবোধ দেন যে, বড়লোকের ছেলেরা প্রায় এই রকমই হয়। আমার শ্বশুরও নাকি এমনি ছিলেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও-ভাব কেটে গেছে। বুঝেছ বোন্, আমি অপেক্ষায় আছি,—স্বামীর আরো বয়স বৃদ্ধি হবে কতদিনে—আমি সেই সময়ের জন্যই বুক বেঁধে বসে আছি। হা ভগবান! কবে আমার কাল যৌবন যাবে, তবে আমার স্বামী বাহিরের মধু খাওয়া ছেড়ে দিয়ে ঘরের ভোম্‌রা হবে!"

সত্যই পরদিন হইতে দেখিলাম, আমার উপর উপদ্রব একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অনুভবে বুঝিলাম বধূর কল-কাঠি নাড়ার পরিণাম!

সুখে-দুঃখে জমিদার বাড়ীতে বেশ কাটাইতেছিলাম। এমন সময় বাড়ীতে হুল-স্থূল পড়িয়া গেল। জমিদারের একমাত্র পুত্র খোকা-বাবুর অসুখ। রোগ না কি বড় খারাপ!

চিকিৎসার ধুম পড়িয়া গেল। ঘন-ঘন ডাক্তার আসিতে লাগিল। প্রতিদিন বৈকালে আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতিতে বাড়ীতে ভীড় জমিতে লাগিল।

গৃহিণীর স্বস্ত্যয়নের জোরে, অথবা তাঁর পুত্র বধূর হাতের নোয়া ও সিঁথির সিঁদুরের মর্য্যাদায়, কিসের জন্য জানিনা খোকাবাবু ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। তারপর রোগ উপশমের সঙ্গে সঙ্গে সব বিষয়ই হাল্কা হইয়া গেল। জমিদারের পুত্র-বধূ প্রথম হইতেই স্বামীর শুশ্রূষায় নিযুক্তা ছিলেন; এবং সর্ব্বদাই তাঁহার পাশে থাকিয়া

স্বামীর হুকুম তামিল করিতেন। আবার জমিদারের পুত্র-বধূর আদেশ পালন করিবার জন্য আমাকেও অষ্টপ্রহর তাঁহার আশে-পাশে থাকিতে হইত। যেহেতু আমিই তাঁর খাস পরিচারিকা।

যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঔষধ পথ্য দিবার জন্যেও জমিদার পুত্রের ঘরে অহরহ আমাকে যাতায়াত করিতে হইত। কিন্তু হায়রে মন্দভাগ্য! আমার প্রতিও যে পাপিষ্ঠ লম্পটের কুদৃষ্টি পড়িয়াছে, সে কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই!

নরাধম পিতার কুলাঙ্গার পুত্র খোকাবাবু রোগ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরের কারবার কমাইয়া দিলেন। দেখা গেল, বেশীর ভাগই তিনি অন্দরে ঘুরিয়া বেড়ান। তিনি বাড়ীতে থাকিতেছেন দেখিয়া, তাঁহার মাতা ও স্ত্রী উভয়েরই মনে খুব আনন্দ হইতেছিল। অবশ্য হইবারই কথা বহুদিন পরে হারানো স্বামীকে নিকটে পাইয়া অভাগিণী নারীর অনুরাগ যথেষ্ট বর্দ্ধিত হইল! স্বামীর পূর্ব্ব অবিচারের কথা সমস্তই তিনি ভুলিয়া গেলেন। তাঁহারা দুইজনে স্বামী-স্ত্রীতে ঘরে বসিয়া গল্প করিতেন, আর নানা কারণে কাজের অছিলায় প্রায় সর্ব্বদাই আমার ডাক পড়িত। এবং আমাকেও বাধ্য হইয়া খোকাবাবুর সামনে হুকুম তামিল করিবার জন্য হাজির হইতে হইত। প্রথম প্রথম আমার বড়ই লজ্জা করিত। কিন্তু কতকটা আমার সখীর, অর্থাৎ জমিদার পুত্রবধূর বিদ্রূপেও বটে আর কতকটা নিয়তই কাজে অকাজে তাঁহার ঘরে যাওয়া আসা করার জন্যও বটে, আমার লজ্জা অনেকটা কমিয়া গেল। লম্পট আমার প্রতি কোন খারাপ ব্যবহার করিত না। কিন্তু আমি তাহার ঘরে যাইলেই এক দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাইয়া

থাকিত। সে লালসাময় দৃষ্টির অর্থ আমি অনায়াসেই বুঝিতে পারিতাম। আবার অনেক সময় হঠাৎ তাহার সহিত আমার চোখো-চোখি হইলেই ফিক্ করিয়া সে হাসিয়া ফেলিত। আমি তখন লজ্জায় মরিয়া যাইতাম। আবার কোনো দরকারের সময় নিকটে যাইলে, আমাকে অনাবশ্যক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আমার মুখের দিকে সে বেহায়া নির্লজ্জের মত চাহিয়া থাকিত!

২৩

খোকাবাবুর উৎসাহে একদিন বাড়ীর সকলের বায়স্কোপ দেখিতে যাইবার বন্দোবস্ত হইল।

গিন্নী আমাকে বলিলেন, "দেখ, প্রমীলা, আমাদের ফিরতে অনেক রাত হবে। তুমি রাত্রের খাবারটা তৈরী ক'রে রেখ। একটু বরং সকাল-সকালই কোরো, কারণ খোকা এই সেদিন অমন কঠিন অসুখ থেকে উঠেছে; বেশী রাত্রি ক'রে খেলে হয়তো আবার ওর অসুখ করবে। ও এক সময়ে বায়স্কোপ থেকে এসে সকাল-সকাল কিছু খেয়ে যাবে। এলেই ওকে তার খাবারটা দিয়ে দিও। গরবিনী থাকলো। সে তোমাকে সাহায্য করবে।"

খোকাবাবু, জমিদার-গিন্নী, বধূঠাকরুণ ও অন্দরের ঝি-চাকর সকলকে লইয়া মহোৎসাহে বায়স্কোপ দেখিতে চলিয়া গেলেন। অন্দরের মধ্যে কেবল গরবিনী-ঝি ও আমি থাকিলাম। একমনে রাত্রের খাবার

করিতেছি। রাত্রি তখন সাড়ে সাতটার কাছাকাছি, এমনি সময় খোকাবাবু অতি ব্যস্ততার সহিত আসিয়া বলিলেন, "প্রমীলা, যা তোমার হয়েছে শীগ্‌গির তাই নিয়ে এস। ক্ষিদেও পেয়েছে, আবার ফিরে গিয়ে বায়স্কোপ থেকে ওদের সব নিয়েও আসতে হবে।" এই বলিয়া তিনি তেতলায় নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

আমি মহা সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। কি করিব ভাবিতেছি, দেখি গরবিনী আসিয়া উপস্থিত! তাহাকে দেখিয়া অনেকটা সাহস হইল এবং বলিলাম, "গরবিনী, খোকাবাবু এখনই খেতে চাইছেন। কিন্তু সব জিনিষ যে এখনও আমার হয়নি; আর আমি একলাই বা উপরে তাঁর ঘরে কেমন ক'রে যাবো?"

গরবিনী মুচ্‌কি হাসিয়া, তার ডান হাতটা আমার মুখের কাছে নাড়িয়া বলিল, "তুমি কি বাগবাজারের নবীন ময়রার রসগোল্লা? তাই ঘরে পেলেই টপ্‌ করে তোমাকে মুখে ফেলে গিলে নেবে! যা হয়েছে, তাই নিয়ে যাও, বরং চলো আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।"

সে-ও আমার সঙ্গে খোকাবাবুর ঘরে যাইবে শুনিয়া আমি আশ্বস্ত হইলাম।

তুমি ততক্ষণ জায়গাটা ক'রে দিয়ে এস, আমি খানকতক লুচি ভেজে নিই।"

—"আচ্ছা" বলিয়া গরবিনী জায়গা করিতে উপরে চলিয়া গেল। আমি সেই অবসরে খানকতক লুচি ভাজিয়া লইলাম। তারপর লুচি-তরকারি প্রভৃতি থালে সাজাইয়া গরবিনীর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

সে আসিলে, আমি খাবার দিতে খোকাবাবুর তেতলার ঘরে চলিলাম। গরবিনী আমার পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল।

যে ঘরে ধূর্ত্ত নরপশু অবস্থান করিতেছিল, সেই ঘরেই খাবার লইয়া গেলাম। তাহার খাটের কিছু দূরে গরবিনী আসন পাতিয়া, গ্লাসে জল দিয়া, খাবার ঠাঁই করিয়া রাখিয়াছিল।

*　　　*　　　*

আমি খাবার-থালাখানা যথাস্থানে রাখিতে যাইব, এমন সময় দুর্ব্বৃত্ত পিছন দিক হইতে আমাকে দুই হাত দিয়া, তাহার বুকের উপর জোরে চাপিয়া ধরিল! সঙ্গে সঙ্গে আমার হাতের থালা বাটী ঝন্ ঝন্ শব্দে মাটীতে পড়িয়া গেল! আর ঠিক সেই সময়েই পিশাচিনী গরবিনী সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল! এই তিনের গোলযোগে আমি যেন কি রকম হতভম্বের মত হইয়া পড়িলাম! চোখে তখন সমস্ত অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল। হাত, পা সর্ব্বশরীর আমার কদলি-পত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল যেন আমি খুব উচ্চ স্থান হইতে সশব্দে নিম্নে পড়িয়া গিয়াছি এবং আমার চেতনা-শক্তিও যেন লুপ্ত হইয়া গেছে! বাহ্যজ্ঞান আমার নাই!

হায়! হায়! কি করিয়া কি হইল কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। যখন নিজেকে বাঁচিয়া আছি বলিয়া অনুভব করিতে পারিলাম, দেখিলাম আমি তখনও সেই পাষণ্ড নারীঘাতক লম্পটের অঙ্কশায়িনী হইয়া পড়িয়া আছি! শুধু পড়িয়া থাকা নয়, নরাধম আমকে এমন দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়াছে যে, আমার বিন্দুমাত্রও নড়িবার সামর্থ্য নাই! আমি যেন দুর্দ্দান্ত ব্যাঘ্র কবলিতা অসহায়া হরিণী!

কোন এক ভয়ানক বিভীষিকাময় উত্তপ্ত মরুপ্রান্তর হইতে ততোধিক বিভীষিকাপূর্ণ, আগুনের হল্কার চেয়েও ভীষণ দমকা বাতাস আসিয়া আমার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রদীপটি নিভাইয়া, সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও ঝলসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল!

বর্ত্তমান অবস্থায় বেশ বুঝিতে পারিলাম; নিজের ক্ষণিক অসাবধানতার জন্যই, পিশাচ আমার নারীত্বের শ্রেষ্ঠ রত্ন অপহরণ করিয়াছে! যাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য দীর্ঘ তিন বৎসরকাল প্রতিনিয়ত কত কষ্ট কত লাঞ্ছনা কত অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছি। হা আমার মন্দভাগ্য! আজ নরাধম নিজের ক্ষমতার মধ্যে পাইয়া, সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া, আমার শ্রেষ্ঠ রত্ন জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া, আমার উন্নত মস্তক পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া গুঁড়াইয়া মাটির সহিত মিশাইয়া দিল!

ওগো! সমাজপতিরা! ওগো! দেশবাসী! দেশের দণ্ডমুণ্ডের মালিক! ওগো! গর্ব্বান্ধ মনুষ্যত্ববর্জ্জিত দানবের চরিত্রধারা মানব! কি মহাপাপে আজ আমার এমন শাস্তি হইল! সহায় সম্বলহীনা অভাগিনী রমণী আমি, আমি তোমাদের কী করিয়াছি!

নারী হইয়া জন্মিয়া, এতদিন যে নারীত্ব-গৌরবে গরবিনী ছিলাম, ক্ষণিক সুযোগ পাইয়া নরপিশাচ গৌরবের শিখর হইতে টানিয়া আনিয়া, আমাকে পথের ধূলার সহিত মিশাইয়া দিয়া, কপালে কলঙ্ক-টিকা আঁকিয়া দিল—আজ কোন্ বিচারে, অথবা কোন্ নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া! শুধু আমি নই, এই সৃষ্টিছাড়া দেশে কত শত-সহস্র সতী-নারী এই সব নরপিশাচদের অত্যাচারে, নিজেদের সতীত্ব রত্ন হারাইয়া, দীনা

কলঙ্কিনীর ন্যায় কুৎসিৎ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতেছে। সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা বাঙলার সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী হিন্দু মহারথীদের কয়জনে তার খোঁজ রাখে!

এই সকল কামুক পিশাচেরা, নিজেদের কামের ইন্ধনে কত শত অবলা কুলবধূকে পোড়াইয়া, সোনার সংসার ছারখার করিয়া, তাহাদিগকে পথের ভিখারিণী করিতেছে। আবার ওদিকে দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারী এই প্রবলেরা, সমাজের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া, সমাজ-নেতা সাজিয়া, সমাজের নিকট হইতেই শ্রদ্ধা, সম্মান আদায় করিয়া লইতেছে!

এই সকল নরপশুরা মনে করে, নারীর নারীত্ব হরণ করাই একটা পৌরুষ। ক্ষণিকের লালসা চরিতার্থ করিতে গিয়া, একটা নারীর জীবন চিরজন্মের জন্য ব্যর্থ হইয়া যায়, তাহা তাহারা মোটেই ভাবে না! এক-একটী কুলবধূকে কুলের বাহিরে আনিলে, শুধু তারই জীবন নয়, আরও অনেক জীবনে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠে, সে জ্ঞান কি তাহাদের একটুও নাই।

অথচ বলিতে আমার মত দীনা কলঙ্কিনী নারীরও লজ্জায় মাথা হেঁট হয়—এই সকল অত্যাচারী নরপশুরাই আবার অর্থের জোরে আইনের চোখে ধূলি দিয়া, সমাজের মধ্যে বুক ফুলাইয়া বেড়াইতেছে এবং কুষ্ঠ-ব্যাধিগ্রস্ত পঙ্গু সমাজ তাহা নীরবে সহ্য করিতেছে, প্রতিকারের কোনই চেষ্টা নাই।

শাসন করা দূরের কথা সবলের প্রতি সমাজের ভালো করিয়া চাহিবারই সাহস নাই! ঘেয়ো কুকুরের মত মেয়েদের বেলাতেই যত ঘেউ ঘেউ চীৎকার!

দেশের আইন যদি এই সকল নারী-হত্যাকারী দস্যুদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিত, তাহা হইলে হয় ত বা কখনো দেশ হইতে এ পাপ দূর হইত। যে সংসারে নারীর অপমান হয়, সমাজের ভয়ে সে সংসারের লোকেরা তাহা নীরবে সহ্য করে। রাজদ্বারে যাওয়া ত দূরের কথা, অন্য দশজনকেও এই ব্যাপারটা তাহারা গোপন করিয়া থাকে। কারণ সামাজিক বিচারে বংশের ইহাতে সম্মান হানি ঘটে! যদি বা কেউ রাজদ্বারে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, অনেক সময় হয়তো অর্থের অভাবে পারিয়া উঠে না। আবার যদি বা হাজারের মধ্যে একজন, রাজদ্বারে স্বাক্ষী প্রমাণ হাজির করিয়া দোষীর দোষ সাব্যস্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে হয় ত শাস্তি হয়, কিন্তু সে শাস্তি এতই লঘু যে, সেই সামান্য শাস্তির ভয়ে এই সকল দুর্ব্বৃত্তদের মন হইতে পাপ-বাসনা দূর হয় না বরং শাস্তি ভোগান্তে অতিমাত্রায় কুপিত হইয়া তাহারা অর্থের সাহায্যে সাধারণকে বশীভূত করিয়া প্রতিশোধ-পিপাসা চরিতার্থ করিতে পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজ চালাইতে থাকে।

নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ সতীত্ব। নারী নিজের জীবনাপেক্ষা সতীত্বটাকেই বেশী প্রিয় মনে করে। ইতিহাসের পাতায় দেখা যায়, লক্ষ লক্ষ নারী, এই সতীত্ব অবমাননার ভয়ে জহরব্রত লইয়া নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে! কাজেই নারীরা যখন জানে, তাহাদের জীবন অপেক্ষা সতীত্বই শ্রেষ্ঠ, তখন যদি কেহ কোনো নারীর জীবনাদপি শ্রেষ্ঠ সতীত্ব রত্ন হরণ করে, তাহা হইলে মাতৃজাতির সর্ব্বস্ব অপহরণকারী সেই দস্যুর পার্থিব প্রাণদণ্ডও লঘুদণ্ড বলিয়া আমার মনে হয়! তাহা ছাড়া শুধু একজনের না—এই হীনাদপিহীন কার্য্যে সাহায্য-

কারী থাকে যাহারা, তাহাদেরও দণ্ড প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। অন্ততঃ আমার ইহাই মনে হয়। আমি যে ভবের হাটে আজ সর্ব্বস্বান্ত! এ যে কি জ্বালা,—আমি যেমন জানি, তেমন করিয়া যাহারা জানে তাহারাই ইহার মর্ম্মন্তুদ্ যাতনার বিষয় বুঝিতে পারিবে!

কবি মর্ম্মপীড়িত হইয়া গাহিয়াছেন!

'দোষ কারো নয় তো মা,
আমি স্বখাত সলিলে
ডুবে মরি শ্যামা!'

আজ আমাদের এই সমাজ নিষ্পেষিতা নারীদের সর্ব্বদাই সতর্ক হইয়া বাস করার সময় আসিয়াছে!

নারীরা নিজদিগকে নিতান্ত অসহায়া অবলা মনে না করিয়া, আপন আপন শক্তির উপর বিশ্বাস করুক। শারীরিক ও মানসিক উভয় বিধ শক্তিই নারীকে সঞ্চয় করিতে হইবে। তাহারা যে শক্তি স্বরূপিনী জাতীর জননী, এ কথা যদি সর্ব্বদায় জন্যই তাদের মনে থাকে, তাহা হইলে পাপ পথচারী এই সকল অবাধ্য সন্তানদের শাসন করিতে কতটুকু সময় লাগিবে?

কোনোরূপে পিশাচের বাহুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া, বিছানা হইতে উঠিতেই লম্পটের উপর দৃষ্টি পড়িল। লক্ষ্য করিলাম, সে আমার দিকে চাহিয়া মৃদু-মৃদু হাসিতেছে। বাঁদরের মত ঐ পোড়া মুখের বেহায়া হাসি দেখিয়া আমার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল! "পিশাচ আমার নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ রত্ন কেড়ে নিয়ে, পথের ভিখারিনী করে, আবার আমার দিকে তাকিয়ে হাসছিস্?"

প্রমীলার আত্ম-কাহিনী

এই কথা কয়টি আপন মনে বলিয়া নিজের বাম-পা তুলিয়া সজোরে তাহার মুখে পদাঘাত করিয়া আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া বরাবর নীচে, বাড়ীর বাহিরে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম !

তার পর ?

তারপর আমাদের মত অভাগিনী নারীর ভাগ্যে যাহা সচরাচর ঘটিয়া থাকে এ ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। সাধারণের দৃষ্টি হইতে আত্মগোপন করিবার জন্য, পুণ্যের তীর হইতে ডুবিয়া মরিবার জন্য পাপের সাগরে আমি ঝাঁপ দিলাম ! আমি অতল জলে ডুবিলাম—ওগো ! তোমরা সব শুনিয়া রাখো, তোমাদেরই অত্যাচার জর্জ্জরিত হইয়া আমি আত্ম-ঘাতিনী হইলাম গো !—আমি মরিলাম—জন্মের মতই—মরিলাম !!

পাপের উত্তাল তরঙ্গময় সাগর গর্ভ হইতে আজ আবার প্রাণ হীন পূতিগন্ধময় কঙ্কালাবশেষ কলঙ্কিত এই নশ্বর নারীদেহ ভাসিতে ভাসিতে তোমাদেরই পদতললীনা হইয়াছে ! হে মানব ! হে বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ প্রতীক ! আপন আপন মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়া আমার এ তুচ্ছ নারী দেহের তোমরা সৎকার কর ! এ দেহ আজ তুচ্ছ গলিত শবদেহ হইলেও, তোমাদেরই জননীর দেহ !

শান্তি ! শান্তি !! শান্তি !!!

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল—**চেনা ও জানা** ২৲

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত—**অধিবাস** ২৲।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—**দিন মজুর** ২৲।

শ্রীসুবোধ বসু—**নব মেঘদূত** ১৷৷০।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—**অন্তরীক্ষ** ২৲, **চলচ্ছায়া** ২৲

শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—**জবাব** ১৷৷০, **কিরণলেখা** ১৲।

শ্রীশ্যামধন বন্দ্যোপাধ্যায়—**বাঁশী** ২৲, **চলতি দুনিয়া** ২৲।

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল—**রূপসী** (ভৌতিক বড়গল্প) ১৲, **বড় মা** ১৷৷০,
ফিরে পাওয়া ১৷৷০, **ভৌতিক কাহিনী** ১৲

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়—**পল্লীর মেয়ে** ১৷৷০

শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু—**বিচিত্র ভূবন** (ব্রহ্মদেশের কাহিনী) মূল্য—২৲

শ্রীবিপিনবিহারী ঘোষ—**জগবন্ধু** জীবনী উপন্যাস) ১৷০

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য—**স্বর্ণকুটীর** ১৷৷০,

শ্রীরীবেন্দ্রনাথ পাল—**ফুলের হাওয়া** ১৷৷, **লক্ষ্মীলাভ** ১০

শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী—**চিত্রলেখ** ১৷০।

বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়—**জাপানী মুখোস** (ডিটেক্টিভ উপন্যাস) ৸৹

শ্রীপ্রভাবতী দেবী—**হৃদয়ের চাঁদ** ২৲

শ্রীনরেশ্বর ভট্টাচার্য্য—**জীবন ধারা** ১৷৷০।

শ্রীবৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য্য—**মুর্খ কে** ১৲,

শ্রীসুরুচিবালা রায়—**আহুত** ১৲।

শ্রীচারুশীলা মিত্র—**সোনার কমল** ১৷৷০।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—**পুরোহিত** ২৲, **শেষ অধ্যায়** ১৷৷০
বাঁকা পথ ১৷৷০

শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়—**সতীলক্ষ্মী** ২৲, **কমলার অদৃষ্ট** ১৷৷০
স্বর্ণ প্রতিমা ১৷৷০